প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শিক্ষা

আব্দুল হাই

শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা
শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষা

প্রাসঙ্গিক ভাবনায় শিক্ষা

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক ভাবনায় শিক্ষা

আব্দুল হাই

ঐতিহ্য

www.pathagar.com

প্রাসঙ্গিক ভাবনায় শিক্ষা
আব্দুল হাই

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪২২
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

PRASANGIK BHABNAY SHIKKHA by Abdul Hai
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2016

E-mail: oitijjhya@gmail.com

Copyright©2016 Abdul Hai
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

Price: Taka 150.00 US$ 4.00
ISBN 978-984-776-222-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মীম ও ঐশী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা বা শুরুর কথা

ইতিহাসে বর্ণিত এক দুর্ধর্ষ বাহিনীর মহানায়কের নাম চেঙ্গিস খাঁ। তিনি মোঙ্গলদের নেতা ছিলেন। মোঙ্গলরা ছিল যাযাবর শ্রেণির লোক। তারা শহুরে শিল্পকলা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখত না। তাই বলে তাদেরকে বর্বর জাতিও বলা যাবে না। তাদের একটি নিজস্ব জীবনধারা ছিল এবং এর ওপর ভিত্তি করেই চেঙ্গিস খাঁ এই যাযাবর জাতিকে একত্র করে এমন এক বাহিনীর রূপ দেন যা তাঁর সফল নেতৃত্বে এশিয়া থেকে মধ্য ইয়োরোপ পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়িয়েছে। চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলদের বাহিনীকে প্রতিহত করার শক্তি তাঁর সমসাময়িককালে কারোরই ছিল না। তাই ইতিহাস আলোচনায় কেউ কেউ এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে তাঁর সামনে আলেকজান্ডার এবং সিজারও নস্যি। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইতিহাসের এই মহানায়ক জীবনে লেখাপড়ার ছোঁয়া পাননি। তিনি এত বড় বাহিনীকে কেবল মৌখিক আদেশের ওপর নির্ভর করেই পরিচালনা করতেন। জীবনের শেষ দিকে লেখাপড়া জাতীয় একটি বিষয় আছে বলে তিনি জানতে পারেন। তখন তিনি তার মেধা দিয়ে লেখাপড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাই তো তিনি তাঁর সন্তান এবং অধীনস্ত জেনারেলদেরকে সুযোগ পেলে লেখাপড়া শিখে নেবার উপদেশ দিয়ে যান।

লেখাপড়া জাতীয় একটা বিষয় রয়েছে জানতে পেরে কেউ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলে শিক্ষার চর্চা হচ্ছে এরূপ সমাজে যিনি বসবাস করেন তিনি কি এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবেন? না, তিনি শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন যথেষ্টভাবে। কিন্তু কেবল শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেই চলবে না। আমাদের প্রত্যেককে শিক্ষার পেছনে স্ব স্ব ভূমিকা রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সঠিক ভূমিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে পারে। একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পর যদি দেখা যায় যে এর মধ্যে সঠিকভাবে লেখাপড়ার চর্চা হচ্ছে না তবে একে আমরা একটি প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান বলতে পারি। এরূপ প্রতিষ্ঠানে কারোর জোর প্রচেষ্টায় লেখাপড়ার চর্চা শুরু হলে আমরা বলি অমুকের দ্বারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। বস্তুত প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাণসঞ্চার করাই শিক্ষানুরাগী মানুষের কাজ। আর তা করতে হলে শিক্ষার খুঁটিনাটি বিষয় আমাদের ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে আমাদের কাজের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরূপ আলোচনার জন্যই এ জাতীয় একটি পুস্তক রচনার চিন্তা আমার মনে উঁকি দেয়। আমি প্রায় ত্রিশ বছরব্যাপী শিক্ষকতা করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি দেশে শিক্ষার অবস্থা যেখানে যেভাবে দেখেছি সেখানে আমি শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনার প্রয়াস পেয়েছি।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র উঠে আসলে আমরা আমাদের দেশের শিক্ষার অবস্থান কী তা জানতে পারতাম। এরকম তুলনামূলক চিত্র কেউ আগ্রহী হয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করলে অবশ্যই আমরা উপকৃত হতাম। কিন্তু কাজটি অনেক জটিল ও ব্যয়সাধ্য হবে। এরূপ একটা কাজ করার লোক আমরা নাও পেতে পারি। তাই বড় মনীষীদের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা ভাবনা জেনে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারি।

এদেশে গ্রামাঞ্চলের মানুষ এক সময় মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তাই করত না। আবার ছেলেদেরকেও তারা অনেকটা বয়স হবার পর স্কুলে পাঠাত। তখনকার সময়ের শিক্ষার যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায় সে অনুযায়ী অল্প কিছু শিক্ষার্থী ছাড়া প্রায় সবাই স্কুল-কলেজের গণ্ডি পার হতে না হতেই ঝরে পড়ত। ভালো শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রদের একটি ভালো মানসিক অভ্যাস গঠন করা আবশ্যক। অনেক বয়স হয়ে গেলে সে অভ্যাস গঠন করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এর জন্যেই আগের দিনগুলোতে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার ব্যাপার লক্ষ করা যেত। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের এই যুগে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা কীভাবে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ করতে পারি। এর একটা সমাধান এরূপ হতে পারে যে শিশুদের মনে যে বয়সে পরিবেশের প্রভাব পড়ে সে বয়সে তাদেরকে শিক্ষার পরিবেশে রাখা। আমরা ধরে নিতে পারি দুই বা আড়াই বছর বয়সে শিশুদের মনে পরিবেশের প্রভাব পড়ে। আমরা শিশুদের এই বয়সে শিক্ষার পরিবেশে রাখার জন্য এক ধরনের বিশেষ স্কুলে পাঠাতে পারি। সেই স্কুলকে শিশু স্কুল বলা যেতে পারে। এই স্কুল থেকেই শিশু শিক্ষার উপযোগী "মানসিক গঠন" অর্জনে সফল হবে। "শিশু স্কুল" শিরোনামে পুস্তকটিতে একটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। শিশুদের মধ্যে সফলভাবে জ্ঞান বিতরণ করার জন্য শিশু মনোবিজ্ঞান জানা আবশ্যক। শিশু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তুলে ধরার জন্য "শিশু মনোবিজ্ঞান" শিরোনামেও আরেকটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। বস্তুত শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়েই শিক্ষার্থীকে কী পরিবেশে কী শিখাতে হবে তা চিন্তা ভাবনা করা দরকার। এই পুস্তকটি বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ওপর আলোকপাত করার প্রয়াসমাত্র।

এই পুস্তক রচনায় আমি আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করেছি। এই জাতীয় মৌলিক চিন্তাভাবনায় ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতেই পারে। চিন্তাশীল পাঠক বইটি পড়ে ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দিলে উপকৃত হব। প্রকৃত অর্থে "শিক্ষাই হোক জাতির মেরুদণ্ড"– এই প্রত্যাশায় শেষ করছি।

আব্দুল হাই

www.pathagar.com

সূচি

আলংকারিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা/১১
শিশু স্কুল/১৫
শিশু মনোবিজ্ঞান/২১
শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা/৩৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের ভূমিকা/৩৮
ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক/৪৯
প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা/৫৮
পরীক্ষা/৬৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলংকারিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অভিজাত শ্রেণির মানুষের একটি বিশেষ প্রবণতা ছিল। তারা প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করতেন এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলতেন। তা ছাড়া তারা ছিলেন পোশাক আশাকের ব্যাপারে ফ্যাশন দুরস্ত এবং আদব কায়দায় খুবই সতর্ক। অঢেল সম্পদের মালিক হওয়ায় তাদের কাজকর্ম করতে হতো না। তাই তাদের উৎপাদনমুখী শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। তাদের শিক্ষায় প্রাধান্য পেত প্রাচীন সাহিত্য। এখানে প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা আলংকারিক শিক্ষা বলে অভিহিত করতে পারি। এই শিক্ষার কোনো ব্যবহারিক দিক ছিল না এবং এর পুরোটাই ছিল অভিজাত শ্রেণির লোকের অধিকারে।

অপর দিকে সাধারণ মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ ছিল না। তারা জীবন যাপনের জন্য কর্মের ওপর নির্ভর করত। অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের জন্য সাধারণ মানুষকে কোনো না কোনো কর্ম করতে হতো। তাই তাদের জন্য এই কর্ম করার জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন ছিল। যে শিক্ষা মানুষকে কর্মের জ্ঞান দান করে তা ব্যবহারিক শিক্ষা।

ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন বা আহরণের উপায় বের করে। সাধারণ মানুষের জন্য তাই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবহারিক শিক্ষায় তাই কাজই বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু কাজ করলেই এর ফলাফল কার্যকরী হবে– তা বলা যাবে না। একটি কাজের পরিণতিস্বরূপ আরেকটি কাজ দেখা দিতে পারে। এই পরিণতিমূলক কাজের ফলাফল দেখা প্রয়োজন। লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করা হয়। লাঙ্গল দিয়ে জমির মাটি ওলটপালট করে দিলেই চাষের কাজ মানুষের উপকারে আসে না। কিন্তু আমরা জানি লাঙ্গল দিয়ে জমির মাটি ওলটপালট করার মাধ্যমেই জমিকে বীজ বোনার উপযোগী করে তোলা হয়। বীজ বোনার পর জমিতে শস্য উৎপাদিত হলে এই শস্য খাদ্যের অভাব দূর করে এবং মানুষের জীবন রক্ষা করে। এভাবে পরিণতিমূলক কাজের ফলাফল দিয়ে আমরা মূল কাজ কার্যকরী কি না তা দেখতে

www.pathagar.com

চাই। অনুরূপভাবে একটি জীবন অন্য একটি জীবনের উপায়স্বরূপ হলেই তা কার্যকরী হয় না। কারণ জীবনের ভালোমন্দ দুটো দিকই থাকে। ভালো জীবনের উপায়স্বরূপ হলেই আমরা প্রথমোক্ত জীবনকে কার্যকরী বলতে পারি।

শিক্ষার ব্যাপারটি উদ্দেশ্য নয়, বরং তা উদ্দেশ্য লাভের উপায়। একটি যন্ত্র তৈরি করার জ্ঞান শিক্ষার অঙ্গ। কিন্তু এই যন্ত্র তৈরি করাটাই উদ্দেশ্য নয়। যন্ত্রের দ্বারা দ্রব্য উৎপাদন করা ও দ্রব্যের ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন সুখী করে তোলাই উদ্দেশ্য। এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, যে জ্ঞান জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন বা আহরণ করতে আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে তাই ব্যবহারিক বা কার্যকরী শিক্ষা।

এই আলংকারিক শিক্ষা ও কার্যকরী শিক্ষার কোনটি বালক বালিকারা অধ্যয়ন করবে? ব্যবসা বা বৃত্তির প্রয়োজনে তাদেরকে টেকনিক্যাল শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন কি না? শিল্পের রসবোধ সাধারণ মানুষের আনন্দের হেতু হতে পারে কি না?

উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে হলে আমাদের কার্যকরী শিক্ষার সঙ্গে আলংকারিক শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। ব্যবহারিক শিক্ষায় বারো ইঞ্চিতে এক ফুট এবং তিন ফুটে একগজ হয়। ব্রিটিশ পদ্ধতির এই পরিমাপের জ্ঞান যে দেশে পরিমাপের একক হিসেবে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত সে দেশে একেবারেই অকেজো। পক্ষান্তরে নাটকের রস উপলব্ধি মানসিক জগতের এক অমূল্য সম্পদ। এই সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়া সব দেশের মানুষের জন্যই আ[illegible]র বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। নাটকের রসবোধ ব্যবহারিক জীবনে অর্থহীন হলেও তা মানসিক সম্পদ হিসেবে সমাজে চমৎকার মানুষের জন্ম দেয়।

শিক্ষা বিষয়ে সমাজের অভিজাত শ্রেণি ও গণতন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। অভিজাতরা অবসর জীবনে বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। আলংকারিক শিক্ষা অভিজাতদের এরূপ জীবনযাপনের উপযোগী। অভিজাতরা আলংকারিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন বলে সমাজের সুবিধা-প্রাপ্ত শ্রেণি অভিমত দিয়ে থাকেন। তারা আরও মনে করেন, নিম্নশ্রেণির মানুষকে এমন শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন যাতে তারা অভিজাত শ্রেণির স্বার্থের অনুকূলে দৈহিক শক্তি ব্যয় করে। কিন্তু গণতন্ত্রীরা সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির মতের বিরুদ্ধে কথা বলেন। তারা দেখতে পান সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির পূর্বোক্ত অভিমত সমাজের সার্বিক কল্যাণের অনুকূল নয়। তাই গণতন্ত্রীরা অভিজাতদের আলংকারিক শিক্ষা অপছন্দ করেন। তারা মনে করেন, দিন মজুরকে কেবল কার্যকরী শিক্ষার বলয়ে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়। তারা আরও মনে করেন যে, সমাজে শ্রেণি বিভাজিত শিক্ষা মঙ্গলজনক হবে না। তাই সমাজে শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের ধারণা, সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের জন্য অধিক পরিমাণে আলংকারিক

www.pathagar.com

শিক্ষা ও অভিজাত শ্রেণির জন্য অধিক পরিমাণে কার্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আলংকারিক শিক্ষা ও কার্যকরী শিক্ষার আনুপাতিক মিশ্রণ সমাজে কল্যাণ বয়ে আনবে এবং এই মিশ্রণের অনুপাত গণতান্ত্রিকভাবে নির্ণীত হবে।

অভিজাত ও গণতন্ত্রীরা তাদের বিরোধের জায়গা আরও সম্প্রসারিত করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েও তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য কী হতে পারে তা নিয়ে তাদের মধ্যে দুটো পৃথক ধারণা জন্ম নেয়। একটি ধারণার ধারকরা মনে করত মানসিক দিক দিয়ে আনন্দ লাভ করার মাধ্যম হলো শিক্ষা। কিন্তু চিত্তহারী সংগীত ও স্থাপত্য সৌন্দর্য দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব দূর করতে পারে না। তাই অন্য দল এরূপ ধারণা পোষণ করত যে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য বাড়ানোই শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এভাবে তাদের ধারণায় ওষুধ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিষয় ছিল শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শিল্প, সাহিত্য বা দর্শন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হবে বলে তারা মনে করত না।

দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক আনন্দের মধ্যে একটি যোগসূত্র বিদ্যমান। বলা হয়ে থাকে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা মানসিক আনন্দ অধিক মূল্যবান। কিন্তু কথাটি পুরোপুরি সঠিক নয়। আমরা দেখতে পাই একটি জিনিসের অভাবে অন্য একটি মূল্যবান জিনিস নষ্ট হয়ে যায়। অনরূপভাবে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য খুব মূল্যবান না হলেও এর অভাবে মানসিক গুণাবলি নষ্ট হয়ে যায়।

শিল্প বিপ্লব বৈশ্বিক সভ্যতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়। তা মানুষের জীবনে সুখ এনে দেয় এবং মানুষের কষ্ট লাঘব করে। আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করে খাদ্য উৎপাদন করা হয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থা খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলায় সহায়ক। বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে বলে আবাসন ব্যবস্থার দিক দিয়ে আমরা সুন্দর পরিকল্পনা হাতে নিতে পারি। সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থানাভাব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। তা ছাড়া আরামদায়ক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে সুখী জীবন যাপন করা যায়। দারিদ্র্য মানুষকে অনেক অশুভ প্রভাবের মুখোমুখি করে দেয়। দারিদ্র্য দূর হলে সুখী জীবন যাপন করে আমারা মানবিক গুণাবলি রক্ষা করতে পারি।

পদার্থবিদ্যা, শরীরবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান ব্যতীত আমরা নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে পারি না। ল্যাটিন ও গ্রিক সাহিত্য, বা দান্তে বা শেকসপিয়ার ছাড়া আমরা চলতে পারি। কার্যকরী শিক্ষার এটাই বড় যুক্তি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা যে কেবল বাস্তব জীবনে কাজে লাগে তা নয়, বরং চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্য অপরিসীম। আজকাল বাস্তব জীবন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এই জটিল জীবনের বিভিন্নমুখী সমস্যার সমাধানকল্পে প্রতি প্রজন্মের কিশোর তরুণদের নানামুখী জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে প্রজন্মান্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সাহিত্য, ইতিহাস, সংগীত, শিল্পকলা ইত্যাদির জ্ঞান কিশোর তরুণদের কল্পনা শক্তি বাড়ানোর জন্য আবশ্যক। কল্পনাশক্তি মানুষকে জীবন গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সাহায্য করে। বিজ্ঞান পরিকল্পনাকে বাস্তব ক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে পারে।

কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির জন্য আলংকারিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে সবক্ষেত্রে বিচরণ করা অসম্ভব। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের অভিরুচি অনুযায়ী স্ব স্ব পছন্দের ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ করার চেষ্টা করবে। সবক্ষেত্রেই ছাঁচে ঢালা নিয়মকানুন বর্জন করতে হবে।

এক সময় মনোবিদ্যা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা হিসেবেই বিবেচিত হতো। এর কোনো ব্যবহারিক দিক মানুষ জানত না। কিন্তু আজকাল শিল্প মনোবিজ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, রোগীর মনোবিজ্ঞান ব্যবহারিক শিক্ষার বিষয়। ক্রমেই মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বাড়ছে এবং বাস্তব জীবনে মানুষ এর সুফল পাচ্ছে।

শিক্ষার বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে সময়ই আমাদের বলে দেবে। জ্ঞান অর্জন ব্যতীত ব্যক্তি ও সমাজ অগ্রগতি লাভে সক্ষম হবে না। কিশোর তরুণ তাদের আগ্রহ অনুযায়ী জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করবে– এটাই স্বাভাবিক। বাইরে থেকে কারো উপরে চর্চার বিষয় চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। অনুরূপভাবে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সাহিত্য যে বিরাট ভূমিকা পালন করে তাও অস্বীকার করার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রের সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে সুন্দর জীবন যাপনের জন্য জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

শিশু স্কুল

লক ও রুশো ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীরও আগের দু'জন শিক্ষা সংস্কারক। তাঁরা দু'জনই তাদের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি দূর করেছিলেন। তাঁরা উদার ছিলেন এবং গণতন্ত্রের পক্ষে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তাদের একটি পরামর্শকে আমরা গণতন্ত্রের অনুকূলে মনে করতে পারি না। পরামর্শটি ছিল প্রতিটি শিশুর জন্য একজন বয়স্ক লোক নিয়োগ করা। এই পরামর্শ অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্য লক্ষ লক্ষ বয়স্ক লোক নিয়োগ করা আবশ্যক যা বাস্তবে সম্ভব নয়। কেবল অভিজাতদের পক্ষেই তাদের পরামর্শ মেনে চলা সম্ভব। তাই লক ও রুশোর ব্যবস্থাপত্রটি অকার্যকর বলে আমরা এক গণতন্ত্রের অনুকূল বলতে পারি না। আমাদের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন যার অধীনে প্রতিটি বালক বালিকাই তাদের আত্মবিকাশের সুযোগ পাবে।

এজন্য শিশু শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদের চিন্তাভাবনা পরখ করে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষকদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতে পারেন শিশুদের একটি বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। এই অবস্থা খাঁচায় আবদ্ধ পশুপাখির মতো। 'খাঁচায় আবদ্ধ পাখি স্বাধীনতাহীনতায় তার নিজস্ব গুণ হারিয়ে কতগুলো শিখানো বুলি আওড়াতে শিখে। শিক্ষালয়ে বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে বেড়ে ওঠা শিশুও কতগুলো বিশেষ বিষয় শিখতে পারে। শিশুর স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ এক্ষেত্রে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। শিশুটি বড় হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে না। কারণ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক দিকটি আরোপিত ছাঁচের রূপ লাভ করে। ফলে শিশুটি স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি হারায়। অপরদিকে কোনো কোনো শিক্ষক ভাবতে পারেন যে শিশুদের ওপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে শিশুরা শতভাগ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। শতভাগ নিয়ন্ত্রণহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত বলে শিশু ক্রমে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে। সে কখনো সমাজের নিয়ম শৃঙ্খল মেনে চলতে পারবে না। এরূপ শিশু পরিণত বয়সে সমাজের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই স্কুলে শিশুদের শতভাগ নিয়ন্ত্রণে রাখা বা শতভাগ নিয়ন্ত্রণহীন রাখার কোনোটিই সঠিক পদ্ধতি নয়।

www.pathagar.com

আমরা একটি ফ্রি স্কুলের কথা ভাবতে পারি। সব শিশুর মধ্যেই প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই প্রতিভা কাজে লাগাতে একে সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন। প্রতিভা জেগে ওঠাকে প্রতিভার বিকাশ বলা যেতে পারে। প্রতিভার বিকাশ একটি ধীর ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। প্রতিভা বিকাশের জন্য শিশুকে সুস্থ ও অনুকূল পরিবেশে রাখা প্রয়োজন। পরিবেশ অনুকূল হলেই শিশুর প্রতিভা স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হবে। পরিবেশ অনুকূল না হলে শিশু প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হবে। এই বাধা শিশুর প্রতিভা বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া রুদ্ধ করে দিতে পারে। ফলে প্রতিভা বিকৃত পথে বিকশিত হয়ে শিশুর জীবনকে অস্বাভাবিক অবস্থায় ফেলে দিতে পারে। প্রতিভা বিকাশের স্বাভাবিক ও অনুকূল পরিবেশ শিশুর স্বাধীনতার মধ্যেই রয়েছে। এর জন্য অনেকে ফ্রি স্কুলের কথা ভাবতে পারেন। ফ্রি স্কুলে শিশুদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শিশু স্বেচ্ছায় যা করতে চায় তা করবে। তাকে কিছু করতে বাধা দেয়া যাবে না বা তার ওপর কোনো নিয়মকানুন আরেপ করা যাবে না। বার্ট্রান্ড রাসেল তার স্ত্রী ডোরার সহযোগিতার একটি ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। রাসেল ঐ স্কুলে নিয়ন্ত্রণহীন শিশুদের মধ্যে কিছু সমস্যা দেখতে পান। তিনি দেখতে পান স্কুলের অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা ছোট শিশুদের অত্যাচার করে। এরকম এক অত্যাচারী শিশুকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তরে বলে, তার চেয়ে বড় শিশুরা তাকে অত্যাচার করে। তাই সে ছোটদের মারে। রাসেল উল্লেখ করেছেন, দাঁতের পরিচর্যার জন্য দাঁত মাজা অপরিহার্য। ফ্রি স্কুলে শিশুদের দাঁত মাজার পরামর্শ দিলে অনিচ্ছুক শিশু শিক্ষকদের পরামর্শ ফিরিয়ে দেয়। তাকে পীড়াপীড়ি করলে সে বলে এটা ফ্রি স্কুল না? শিশু বয়সে কেউই ভালোমন্দ সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না। তাই তাদের জন্য বয়স্ক লোকদের পরামর্শ বা দিক নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু স্কুল পুরোপুরি ফ্রি হলে সেখানে এরূপ নির্দেশনা অচল হয়ে পড়তে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে শিশুদেরকে স্কুলের বাঁধাধরা গণ্ডির মধ্যে রাখা ঠিক নয়। তাদের মেধা বিকাশের জন্য স্বাধীনতা দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় ফ্রি স্কুলে নিয়ন্ত্রণহীন শিশুদের মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা দেখা দেয়। তাই সার্বিক বিবেচনায় শিশু স্কুলে সীমিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা ভালো।

শিশু স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কিছু দিন পর রাসেল দেখতে পেলেন স্কুলটিতে অবাধ্য শিশুরা সংখ্যায় বেড়ে গেছে। এর ফলে উদ্ভূত সমস্যা ছিল মারাত্মক। স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকেই এই সমস্যার প্রতি নজর দেয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রথম দিকে তারা শিশু পেলেই খুশি হতেন। ফলে স্কুলে অবাধ্য শিশুর সংখ্যা বেশি হয়ে যায়। অনেক শিশুই ছিল নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক। এদেরকে অবাধ স্বাধীনতা দেবার অর্থ ছিল ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা। এমন পরিবেশে সবল শিশুরা দুর্বল শিশুদের ভয়ের মধ্যে রাখত। শিশুদের মধ্যে অশুভ তাড়না দেখা দিত। ছাত্রদের

www.pathagar.com

মধ্যে এক ভাই ও এক বোন ছিল। তাদের মা ছিলেন এক বদমেজাজি মহিলা। তিনি পরস্পরকে অদ্ভুত স্নেহ প্রদর্শন করতে শিখিয়েছিলেন। শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যাহ্ন ভোজের তদারকির দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক একদিন স্যুপের মধ্যে একটি পিনের অংশবিশেষ দেখতে পান। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে স্নেহশীল বোনটিই স্যুপের মধ্য পিনটি রেখেছিল। "তুমি কি জানতে না যে স্যুপের সঙ্গে পিনটি গিলে ফেললে তুমি মারা যাবে?" "ও হ্যাঁ" সে জবাব দিল, "কিন্তু আমি স্যুপ খাই না।" পরে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সে আশা করেছিল তার ভাইটিই এর শিকার হবে।

রাসেল তৃতীয় আরেকটি অসুবিধার কথাও উল্লেখ করেছেন। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে তিনি বা তার স্ত্রী স্কুলের জন্য সময় দিতে পারতেন না। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি চার বার আমেরিকা ট্যুর করেন। এর মধ্যে ১৯২৭ সালের ট্যুরটি ছিল স্কুলের সূচনা লগ্নে। স্কুলের দ্বিতীয় টার্মে ডোরাও বক্তৃতা দেবার জন্য আমেরিকা যান। এভাবে প্রথম দুই টার্মে তারা কেউই স্কুলে থাকতে পারেননি। তখন শিক্ষকমণ্ডলীর কোনো কোনো সদস্য তাদের অবর্তমানে স্কুলের গৃহীত নীতি অনুসরণ করতেন না। অথচ তাদেরকে স্কুলের নীতিমালা বার বার বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল।

স্কুলের নীতি আদর্শের প্রতি শিক্ষকদের অনুগত থাকা উচিত। এই নীতি আদর্শ সামনে রেখে শিক্ষকগণ প্রতিদিনের কর্ম সম্পাদন করেন কি না দেখার জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা থাকেন তাদের নজরদারি করা উচিত। যারা কাজ করে তাদের কাজে ভুল হতেই পারে। এই ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকলে ভুলত্রুটি ন্যূনতম পর্যায়ে থাকে। কিন্তু নজরদারি ব্যবস্থার অভাবে ভুলের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেখান থেকে প্রতিষ্ঠানকে সংশাধনের পথে নিয়ে আসা খুবই কষ্টকর হবে।

অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় অবাধ্য শিশু স্কুলের সুশৃঙ্খল পরিবেশ নষ্ট করে। কয়েকটি শিশুই স্কুলের পরিবেশ নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। এই সব অবাধ্য শিশুকে স্কুলে ভর্তি করে তুলনামূলক ভালো শিশুদের পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট করতে দেয়া যায় না।

কোনো যান (মোটরগাড়ি, উড়োজাহাজ বা জাহাজ) কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কেনা যেতে পারে। কিন্তু চালকের অভাবে তা ব্যবহার করা যাবে না। চালকই কেবল পারেন তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে। অনুরূপভাবে শিক্ষকই পারেন একটি স্কুলকে ভালোভাবে পরিচালনা করতে। কিন্তু ভালো শিক্ষক ব্যতীত স্কুল অকেজো হয়ে পড়তে পারে। যে শিক্ষক স্কুলকে শিশুদের কল্যাণে পরিচালনা করেন তিনি স্কুলের প্রাণ। তাকে কেবল শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি জানলেই হবে না। শিশু মনোবিজ্ঞান সম্পর্কেও তার যথাযথ জ্ঞান থাকা

www.pathagar.com

দরকার। শিক্ষককে বুঝতে হবে শিশুর ওপর জোর করে কোনো কিছু আরোপ করা হলে এর ফলাফল ভালো হবে না। শিশুকে আনন্দের মধ্যে রেখেই পড়াতে হবে। আনন্দের মধ্যে রেখেও শিশুকে কিছু নিয়ম কানুনের প্রতি অনুরাগী করে তোলা যায়। সহজ নিয়মকানুন শিশুরা সহজে মেনে চলতে পারে। কিন্তু নিয়মকানুন বোঝাস্বরূপ হলে শিশু ভয় পাবে। এতে তার মানসিক ক্ষতি হতে পারে। শিশুকে শিক্ষা জগতের দিকে এগিয়ে নিতে হলে শিশু মনোবিজ্ঞানের বিষয়গুলো জেনে নিয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্কুলে কার্যকর করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা স্কুলগুলোতে শিশু মনোবিজ্ঞানপ্রসূত বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন থেকে শিক্ষকগণ কর্তব্য সম্পাদনে মনোযোগী কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অনেক শিক্ষক ও অভিভাবকের অসচেতনতার দরুন শিশুদের মেধা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক গুণাবলি বিকাশের জন্য শৈশবকাল গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ভয় পেলে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। আবার ত্রুটিপূর্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস নানা রোগের জন্ম দিতে পারে। এতে দেখা যায় ভয় মানসিক ব্যাপার হলেও দেহের ওপর এর প্রভাব রয়েছে। তাই চিকিৎসা বিষয়ক কিছু জ্ঞান ব্যতীত শিশুদের চরিত্র ও স্বাস্থ্য গঠনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যায় না। শিশুর দেহমনের পুষ্টি সাধনের জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন হয় তা অপেক্ষাকৃত নতুন। প্রাচীন জ্ঞান থেকে এই জ্ঞান পুরোপুরি আলাদা। শিশুর শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাসের কথা ধরা যাক। শিশুকে আপনি যেভাবে চলতে বলেন বা আচরণ করতে বলেন শিশু সেরূপ আচরণ না করলে বা চললে আপনি তার প্রতি নত হবেন না। আবার তাকে পরামর্শ শুনতে বাধ্য করার জন্য শাস্তি বা জবরদস্তি করতে পারবেন না। সাধারণ পিতামাতা এর বিপরীত পন্থাই অবলম্বন করেন। তারা শিশুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে শিশুকে মারপিট করেন। পিতামাতার এরূপ ব্যবহার শিশুর চরিত্র গঠনে অনুকূল প্রভাব ফেলতে পারে না। শিশুর চরিত্রের ওপর নীরব প্রভাব বিস্তার করতে হবে। নীরবে প্রভাব বিস্তারের প্রতিক্রিয়ার ব্যবহার চারিত্রিক শক্তি অর্জন ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভব নয়। শিশুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে পিতামাতার ধৈর্য ধারণ করা দরকার।

শিশুর মানসিক বিকাশে পিতামাতার মনস্তাত্ত্বিক আচরণ জরুরি। এর সঙ্গে প্রয়োজন রয়েছে শিশুর মুক্ত বায়ু সেবন ও স্বাস্থ্যের উপযোগী পোশাক পরিধান করা। গ্রামের পিতামাতা নিদারুণভাবে অজ্ঞ হওয়ায় তারা শিশুর প্রতি মনস্তাত্ত্বিক আচরণে অক্ষম। শহরবাসী গরিব ও কর্মক্লান্ত পিতামাতার উপর কু-শিক্ষার প্রভাব অনেক বেশি। অপরদিকে যেসব পিতামাতা উচ্চ শিক্ষিত এবং সন্তানের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন তারা অতি কর্মব্যস্ত না হলেও শিশু শিক্ষার

www.pathagar.com

উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে যথাযথ যত্নসহকারে বাড়িতে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন না।

তাছাড়া স্কুলে অন্য শিশুর সংস্পর্শে আসার ফলে একটি শিশুর যে বাস্তব শিক্ষা লাভ করা সম্ভব বাড়িতে পিতামাতার কাছে সে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। শিশুর খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করে কেবল ধনী পিতামাতাই পারেন যথেষ্ট ফাঁকা জায়গায় শিশুদের খেলার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থার পিছনেও কুফল রয়েছে। ধনী পিতামাতার সন্তান এজন্য অন্যদের সাপেক্ষে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করবে। এই গর্ববোধ নৈতিক শিক্ষার জন্য ক্ষতিকর।

নার্সারি স্কুল বা অন্যান্য শিশু স্কুলের জন্য দক্ষ শিক্ষক প্রয়োজন। দক্ষ শিক্ষকের অভাবে স্কুলের ভালো অর্জনের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে দিকে লক্ষ রেখে স্কুল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সবার সার্বিক সহযোগিতায় ভালো শিশু স্কুল গড়ে উঠতে পারে। ভালো শিশু স্কুল মানে ভালো শিশু তৈরির কারখানা। ভালো শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার বলে দেশে যোগ্য ও ভালো নাগরিক গড়ে তোলার জন্য ভালো শিশু স্কুলের বিকল্প নেই। যারা ভালো শিশু স্কুলে পড়বে এবং যারা ভালো শিশু স্কুলে পড়বে না তাদের মধ্যে শিশু কালেই একটি পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই পার্থক্য শিশুকাল পার হয়ে কৈশোরে এবং কৈশোর পার হয়ে যৌবনে ও পরে বলা যায় সারা জীবনের ওপর একটি প্রভাব ফেলবে।

শিশু স্কুল কেন প্রয়োজন তা আলোচনা না করলে শিশু স্কুলের একটি বিরাট দিক মানুষের নজর এড়িয়ে যাবে। শিশুদেরকে বাড়ির নিভৃত কোণে না রেখে কেন নার্সারি স্কুলে পাঠানো প্রয়োজন তা ভেবে দেখা উচিত। শহুরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাদের পিতামাতা ধনী নন তাদের কিছু বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক দাবি রয়েছে যা গৃহের নিভৃত কোণে মিটানো সম্ভব নয়। এই দাবিগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান দাবি হলো আলো ও বাতাস। মার্গারেট মেকমিলান দেখতে পান নার্সারি স্কুলে ভর্তি হতে আসা শিশুদের একটি বিরাট অংশ রিকেট রেগে পীড়িত। কিছুদিন খোলা আলো বাতাসে খেলাধুলা করার পর শিশুদের এই রোগ দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয় দাবিটি উপযুক্ত খাদ্যের। এটা খুব ব্যয়বহুল নয়। তত্ত্বগতভাবে অনেকেই ভাবতে পারেন যে গৃহকোণেই তা সরবরাহ করা সম্ভব। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব দেখা গিয়েছে। গৃহকোণে শিশুদের খাদ্য সম্বন্ধে বয়োজ্যেষ্ঠদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই গৃহকোণে শিশুদের উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায় না। তৃতীয় দাবি হলো একটু বড় পরিসরের জায়গা। শিশুদের লম্ফঝম্ফ ও খেলাধুলার জন্য তা দরকার হয়। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলাধুলা করতে পারে। কিন্তু রাস্তা খেলাধুলার উপযুক্ত জায়গা নয়। চতুর্থ দাবি হট্টগোল করার সুযোগ পাওয়া। ছেলেমেয়েরা একটু হট্টগোল করবেই। এতে তাদের বাধা দেয়া উচিত নয়। হট্টগোল করার সময় ছেলেমেয়েদের বাধা দিলে নির্দয় মনোভাব

www.pathagar.com

প্রকাশ পাবে। আবার বাড়িতে সমবেত হট্টগোল বয়স্কদের জন্য বিরক্তি সৃষ্টি করে। শিশুর বয়স যখন দ্বিতীয় বর্ষের শেষের দিকে তখন সে প্রয়োজন দেখা দেয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ষষ্ঠ বিষয়টি হলো পিতামাতার নিরন্তর আদর থেকে শিশুদের মুক্ত রাখা। ধনী পিতামাতার সন্তানদের ব্যাপারে এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন। দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের জন্য তা পুরোপুরিভাবে আলাদা। দরিদ্র পিতামাতা জীবিকার সন্ধানে সকাল সন্ধ্যা ছেলেমেয়েদের থেকে দূরে থাকে বলে তারা সন্তানদের প্রতি যত্নবান হতে পারেন না। মধ্যবিত্ত পিতামাতা সন্তানদের অতিরিক্ত আদর দিয়ে তাদের ক্ষতি করে থাকেন। সপ্তম বিষয় হলো উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। স্কুলে খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

আমাদের এই গরিব দেশে দু-চারটা বড় শহরে সীমিত সংখ্যক নার্সারি স্কুল গড়ে উঠেছে। উপজেলা সদরে, এমনকি সব জেলা সদরেও ভালো নার্সারি স্কুল গড়ে উঠেনি। অভিভাবকগণ দুই বছর বয়সী শিশুদেরকে নার্সারি স্কুলে পাঠিয়ে এর সুফল ভোগ করতে পারেন। শিশুরা সকাল আটটায় স্কুলে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। সব শিশুই স্কুলে খাবার খাবে এবং মুক্ত বায়ু সেবন করবে। নার্সারি স্কুলের শিক্ষকগণ সবাই শিশু মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী হয়ে শিশুদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ করবেন। এই শিশুরা প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হবার আগেই অনেক কিছু শিখে ফেলবে। ফলে প্রাইমারি স্কুলে তারা পড়াশুনায় অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকবে। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই নয়, শিক্ষার পরবর্তী স্তরগুলোতেও তারা এগিয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

শিশু মনোবিজ্ঞান

ঊনবিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞান ছিল একটি তাত্ত্বিক বিষয়। সেই অর্থে তার গতি ছিল খুবই সীমিত। এর ব্যবহারিক দিক ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ধীরে ধীরে মনোবিজ্ঞান এর প্রায়োগিক দিকে অগ্রসর হয়েছে। আধুনিক যুগে মনোবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক অনেক সমৃদ্ধ। আজকাল আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ দেখতে পাই। তাছাড়াও দেখতে পাই রোগীর মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞান প্রায়োগিক ক্ষেত্রে ব্যাপকতা লাভ করলে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিক্ষাঙ্গনে এর যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকটি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। শৃঙ্খলা একটি অতি সরল বিষয় হিসেবেই মানুষের ধারণায় স্থান পেত। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ভাবতেন বালক বা বালিকাদের পছন্দ বা অপছন্দের চর্চা করতে দেয়া উচিত নয়। কারণ এতে প্রশ্রয়ের ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই বালক/ বালিকদের পছন্দ বা অপছন্দের প্রকাশকে বয়োজ্যেষ্ঠরা নেতিবাচকভাবে দেখতেন। বায়োজ্যেষ্ঠরা মনে করতেন, বালক যা পছন্দ করবে তা থেকে তাকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে হবে। আবার কোনো কিছুর ব্যাপারে তার অপছন্দ প্রকাশ পেলে তাকে তা করতে বাধ্য করা প্রয়োজন। বালক/বালিকাদের জন্য আদেশ অমান্য করা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। লঘু দৈহিক শাস্তি থেকে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। সামান্য জল খাবারের ব্যবস্থা রেখে নির্জন স্থানে বন্দী করে রাখার মতো গুরুদণ্ডের দৃষ্টান্ত কম দেখা যায় না। আমরা Fair Child Family পুস্তকের সাহায্যে আলোচনা করতে পারি। Fair Child Family পুস্তকে গুরুদণ্ডের বিরবণ রয়েছে। বালক হ্যানরি ল্যাটিন ভাষা শেখার ব্যাপারে পিতার সঙ্গে একমত হতে পারেনি। হ্যানরিকে তার পিতা বুঝিয়েছিলেন ল্যাটিন না শিখলে সে ভালো যাজক হতে পারবে না। কিন্তু হ্যানরি এ ব্যাপারে অমনোযোগী ছিল। তাই তাকে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হয়। সামান্য জলরুটির ব্যবস্থা করে তাকে নির্জন কুটিরে আটকে রাখা হয়। তার সঙ্গে তার বোনদের কথা বলতে নিষেধ ছিল। বোনদেরকে বলে দেয়া হয় যে সে ঈশ্বরের কাছে অপরাধ হয়েছে। এক বোন

www.pathagar.com

তাকে গোপনে খাবার সরবরাহ করলে সেও শাস্তি পায়। এভাবে কিছুদিনের বন্দিত্ব তাকে ল্যাটিন ভাষার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে। হ্যানরি অধ্যবসায়ের সঙ্গে ল্যাটিন ভাষা শেখার কাজ শুরু করে।

শেহরের গল্পটি একই প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হলেও তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। শেহরের কাকা এক বিড়ালের বাচ্চাকে ইঁদুর ধরা শেখাবার চেষ্টা করেন। বিড়ালের বাচ্চার মধ্যে তখনও ইঁদুর ধরার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়নি। ফলে সে ইঁদুরের প্রতি অমনোযোগী ছিল। শেহরের কাকা বাচ্চাটিকে প্রহার করেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি তার প্রহার কার্য চালিয়ে যান। কিন্তু বাচ্চার মধ্যে আশানুরূপ ফলাফল দেখতে পাননি। তাই শেহরের কাকা ভাবলেন, বাচ্চাটি বোকা এবং শিক্ষার অযোগ্য। তিনি বাচ্চাটির ইঁদুর ধরা শেখাবার চেষ্টা থেকে বিরত হন। পরে দেখা গেল বিড়ালের বাচ্চাটি অন্যান্য ব্যাপারে স্বাভাবিক হলেও ইঁদুর দেখলে ভয় পেত এবং দৌড়ে পালাত। শেহর বলেছেন, "কাকার কাছে ল্যাটিন শেখার ব্যাপারে আমার ভাগ্য ছিল বিড়ালের বাচ্চার মতো।"

গল্প দুটো থেকে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীর ওপর তাদের অভিপ্রায় চালিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষার্থীর ওপর এরূপ নগ্ন আচরণ লক্ষ করা যায় না। তথাপিও শিক্ষায় আজকাল শৃঙ্খলা একেবারে নেই বলা যাবে না। শিক্ষাবিদগণ অনুরূপ আচরণ না দেখালেও শৃঙ্খলা বর্জন করতে চান না। তারা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ভেবে দেখতে চান। মাদাম মন্তেসরি ঘরভর্তি ছেলেমেয়েদের নিয়ে নির্বিঘ্নে কাজকর্ম করতেন। তিনি যেসব পুস্তক লিখেছিলেন এগুলো থেকে তাকে শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনের প্রতি অনুরাগী হতে দেখা যায়। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনের অনুকূল। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হবার পর আনন্দচিত্তে সহজ শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ত। এই শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য ছেলেমেয়েদের জোর করে বাধ্য করা হতো না। সহজ নিয়মগুলোতে ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হতো। ক্রমে ক্রমে একটার পর একটা শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হয়ে একটি সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত হতে ছেলেমেয়েদের অসুবিধা হতো না।

প্রাচীন শিক্ষকদের ধারণা ছিল যে ছেলেমেয়েরা আপন ইচ্ছায় কিছু শিখতে চায় না। তাই তারা ছেলেমেয়েদেরকে শাস্তি দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে পড়াশুনায় মনোযোগী করার চেষ্টা করতেন। পাঠদানের সময় কিছু কৌশল অবলম্বন করলে ছেলেমেয়েদেরকে শাস্তি বা ভয় না দেখালেও লেখাপড়ায় মনোযোগী করা যায়। প্রাচীন শিক্ষকগণ এই কৌশলগুলো জানতেন না বলেই তারা শাস্তি ও ভয় দেখানোকে পড়াশুনায় ছেলেমেয়েদের মনোযোগী হবার উপায় বলে বিশ্বাস করতেন। শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে কিছু সুবিধাজনক ভাগে ভাগ করে

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েদের সামনে উপস্থাপন করলে তা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এভাবে পাঠ্য বিষয় আকর্ষণীয় হয়ে উঠলে ছেলেমেয়েরা তা পড়তে ও শিখতে আনন্দ পায়। আমরা পড়াশুনার ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারি। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সব ছেলেমেয়ে সব বিষয়ে একই রকম আনন্দ পায় না।

ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন বিষয়ে স্ব স্ব পছন্দের চর্চা করে। যে শিশু যে বিষয়ে তার পছন্দের চর্চা করতে চায়, সুযোগ পেলে সে সেই বিষয়ে নিজের মেধার পরিচয় দিতে পারে। তাই বিষয় নির্বাচনে শিশুদের স্বভাবগত পছন্দের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়ে তাকে সে পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা সর্বোত্তম বলে বিবেচিত।

কয়েকটি সরল নিয়মকানুন শিশু সহজেই বুঝতে পারে। এই নিয়মকানুন মেনে চলার ইতিবাচক মনোভাব শিশু মনের বৈশিষ্ট্য। শিশু কয়েকজন একত্র হয়ে খেলাধুলা করে। তারা খেলাধুলায় একে অন্যের সহযোগিতা করে। কখনো তারা পরস্পরের বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। খেলাধুলায় শিশুদের এই বাধা না হয়ে দাঁড়ানো একটি সরল নিয়ম। তাছাড়া দেখা যায় স্কুলে একটি শিশু এক সেটের বেশি খেলার সরঞ্জাম নিজের অধিকারে রাখে না। শিশুরা এই নিয়মগুলো বুঝে এবং মেনে চলতে পারে। সহজ নিয়মগুলো মেনে চলতে অভ্যস্ত হলে অন্যান্য নিয়মকানুনও শিশু মেনে চলতে শেখে। এভাবে যে শৃঙ্খলা অভ্যাসগতভাবে শিশুমনে স্থান পায় তার সঙ্গে প্রবৃত্তি মিশে গিয়ে তাকে আত্মসংযমের উপযুক্ত করে তোলে।

শিশুদের জন্য প্রবর্তিত নিয়ম শৃঙ্খলা সহজ ও আনন্দদায়ক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এগুলো স্কুলের নীতিনির্ধারণী কাজ। প্রভাবশালী শিক্ষক এ কাজটি করবেন। সাধারণ শিক্ষকদের কাজ প্রবর্তিত সহজ ও আনন্দদায়ক নিয়মকানুন প্রয়োগ করা। শিশুরা সহজ নিয়মের অধীন অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ধৈর্যের মতো গুণও আয়ত্ত করতে শেখে।

শিশুদের সম্পর্কে প্রাচীন সমাজে আরেকটি ধারণা বিদ্যমান ছিল। ধারণা করা হতো যে শিশুরা পাপ হতে উদ্ভূত। দুষ্টুমি শিশুদের স্বভাবে স্বাভাবিকভাবে স্থান পায়। এই দুষ্টুমি দূর করে তাদের মধ্যে সদগুণের সঞ্চার করতে হলে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে– এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে শিশুদের ওপর শারীরিক শাস্তি বিধানে বয়োজ্যেষ্ঠরা দ্বিধাবোধ করতেন না। এ ব্যাপারে আমরা ডিন স্টেনলির লিখিত ড. আরনল্ডের জীবনী থেকে কিছু জানার চেষ্টা করব।

ডিন স্টেনলি ছিলেন ড. আরনল্ডের ছাত্র। ড. আরনল্ড ইংল্যান্ডের পাবলিক স্কুলগুলোর সংস্কার করেন। উচ্চ শ্রেণির ইংরেজ গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে ড. আরনল্ডের অবদান। তিনি স্কুলে সাধারণভাবে বেত মারার বিধান রহিত করেন।

www.pathagar.com

তবে মিথ্যা বলা, পানদোষ ও স্বভাব কুড়েমির জন্য অল্পবয়েসীদের মধ্যে বেত্রাঘাত সীমাবদ্ধ রাখেন।

"বেত্রাঘাত অবনতিকর শাস্তি, তা একেবারে বন্ধ করা উচিত" উদারনৈতিক পত্রিকার এরূপ মন্তব্য তাকে ক্রোধান্বিত করে। তিনি এরূপ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে লেখেন :

"এটা কোন ভাবের পরিচায়ক তা আমি জানি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বোধে গৌরবান্বিত জাতি থেকে এর উদ্ভব হয়েছে। তাদের কার্যকলাপ যুক্তির বিচারে গ্রহণযোগ্য নয় অথবা খ্রিষ্টানদের জন্য মানানসই নয়। এটা বর্বরদের উপযোগী কার্যকলাপ। তা শিবলীর যুগে ইয়োরোপকে সংক্রমিত করেছে। এখন জেকোভিয়ানিজমের অভিসম্পাতসহ আমাদের সন্ত্রস্ত করছে। যে বয়সে দোষ ত্রুটির দরুন অপরাধবোধের সন্ধান লাভ করা প্রায় অসম্ভব তখন ব্যক্তিগত ত্রুটি সংশোধনের উৎসাহদানে জ্ঞানের পরিচয় কোথায়? মহান ব্যক্তিদের সবচেয়ে ভালো অঙ্গীকার এবং যুবকের অলংকার স্বরূপ পূর্ণ সরলতা, সংযম ও মানসিক নম্রতার মধ্যে এর চেয়ে আর কী মিথ্যা হতে পারে।"

মানুষ যখন নিজেকে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত মনে করেন তখন তার কাছে তার যাবতীয় কাজ ভালো কাজ বলে মনে হয়। আরনল্ড মনে করতেন যে তিনি প্রেমধর্মের নীতি অনুসারে কাজ করছেন। ফলে তার কৃত যাবতীয় কাজ ছিল ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। তিনি শিশুদের ওপর বেত্রাঘাত অনুমোদন করে নৈতিক অপরাধের প্রতি ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তুলে অনেক নির্দয় মানুষ গড়েছিলেন। শিশুর স্বভাবজাত আলস্যানুভূতি তার মতে অপরাধ।

কিন্তু আধুনিক মানুষ শিশুদেরকে শয়তানের আত্মীয় মনে করেন না। বয়স্ক মানুষের অপরাধের শাস্তি হলে কেউ তাতে দুঃখ প্রকাশ করে না। কিন্তু শিশুদের শাস্তি দেয়া হলে মানুষ দুঃখ পায়। আজকাল শিশু স্কুলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে কেউই চান না।

শিশুরা পাপী হয়ে জন্মায় না। বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে পাপ করতে দেখে তারাও পাপের প্রতি আকর্ষিত হয়। কিন্তু শিশু নৈতিক শিক্ষা পেলে আদর্শ গুণে গুণান্বিত হয়। শিশুরা জন্মগতভাবে ভালো বা মন্দ নয়। কতগুলো প্রবৃত্তি ও প্রতিবর্তী নিয়েই শিশুরা জন্মগ্রহণ করে। পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার এগুলো শিশুদের ভালো বা মন্দ হতে সাহায্য করে। শিশু মা ও ধাত্রীর কাছাকাছি থাকে বলে তার ওপর মা ও ধাত্রীর স্বভাবের প্রভাব পড়ে। শিশুর গুণ বিকাশের বিশেষ বিশেষ প্রণালী বিদ্যমান। কিন্তু দৈহিক শাস্তি তার গুণ বিকাশে প্রভাব ফেলে না। বরং বিপরীত ক্রিয়া করে শিশুর মনোজগতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

জন্মলগ্নে শিশুর মধ্যে কতগুলো প্রতিবর্তী ও প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, কোনো অভ্যাস থাকে না। বার বার দেখে শিশু কোনো বস্তু চিনে নিতে পারে। এভাবে মা

www.pathagar.com

ও পরিচারিকার চেহারাই শিশু প্রথমে চিনে নেয়। শিশু দৃষ্টিশক্তি অর্জনের আগে শ্রবণ শক্তি অর্জন করে থাকে। তাই মা ও পরিচারিকার চেহারা চিনে নেবার আগে শিশু তাদের কণ্ঠের পরিচয় লাভ করে। কোনো বস্তু ভালো করে দেখতে হলে যে দৃষ্টিশক্তির প্রয়োজন সদ্যজাত শিশুর মধ্যে তা থাকে না। মায়ের স্তন ও দুধের বোতলের গন্ধ দিয়ে শিশুর পরিচিত জগতের সূচনা হয়। পরে স্পর্শ, শ্রবণ ও দৃষ্টি একত্রে শিশুকে বস্তু জগতে চিনে নিতে সাহায্য করে। আরামদায়ক পরিবেশে শিশু আনন্দ পায়, কিন্তু যে পরিবেশে শিশু দেহে ব্যথা পায় তা তার জন্যে কষ্টদায়ক। খাবার এবং কোমল উষ্ণতায় শিশু আনন্দ পেলেও অতিরিক্ত ঠান্ডা এবং গরমে কষ্ট পায়। দৈহিক কষ্ট পেলে শিশু কেঁদে ওঠে। আবার কখনো কখনো আনন্দ পাবার আশা করেও শিশু কাঁদে। এই দুই কাঁদার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। শিশুর মা সেই পার্থক্য ধরতে পারেন। সুখ লাভের আশায় শিশু কেঁদে ওঠলে তার কাঁদা নিবারণ না করাই ভালো। সুখ লাভে ব্যর্থ হয়ে সে এক সময় কান্না থামিয়ে দেবে। এভাবে কয়েকবার সুখলাভে ব্যর্থ হলে সে সুখলাভের আশা ত্যাগ করে। আমরা দেখতে পাই অনেকেই শিশুর ঘুমের সময় আসলে তাকে ঘুম পাড়ানির গান শুনান। ঘুমপাড়ানির গান শিশুর কাছে আনন্দদায়ক। বার বার সে একই আনন্দ পেলে এর প্রতি তার একটি মোহ সৃষ্টি হয়। তখন সে এই আনন্দ পেতে ব্যর্থ হলে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বারবার এরূপ ঘটলে ক্রুদ্ধ হওয়া তার স্বভাবজাত হয়ে যেতে পারে।

শিশু আনন্দ লাভ করবে তার নিজের চেষ্টায়। এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করা যেতে পারে। শিশু দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সমর্থ হলে চলমান জিনিস দেখে আনন্দ পায়। হাত দিয়ে কোনো বস্তু ধরতে পেরেও শিশু আনন্দ পায়। কিন্তু এর পূর্বেও শিশু আনন্দ লাভ করে তার হাতপায়ের আঙুল জয় করার মাধ্যমে। শিশুর পায়ের আঙুল সঞ্চালিত হওয়া একটি প্রতিবর্তী ঘটনা। শিশু ইচ্ছা করে নিজে আঙুলগুলো চালায় না, আঙুলগুলো আপনাআপনি সঞ্চালিত হয়। কিন্তু এক সময় শিশু দেখতে পায় আঙুল সঞ্চালন তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। তখন শিশুর আনন্দানুভূতি রাজ্য জয়ের আনন্দানুভূতির মতো হয়ে থাকে। শিশু হাতের কাছে জিনিস পেলে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আনন্দ পাবার চেষ্টা করে।

ক্ষুধা পেলে শিশু চিৎকার করে কাঁদে। শিশু আনন্দ লাভের প্রত্যাশায়ও কাঁদে। তাই শিশুকে কাঁদতে দেখলেই খাওয়ানোর চেষ্টা করা ঠিক নয়। রুটিনমাফিক নির্দিষ্ট সময় পর পর শিশুকে খাওয়ানো উচিত। এতে তার হজম ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। নিয়মিত খাবার খেলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো হয়। তাছাড়া নিয়মিত খাবার শিশুর নৈতিক শিক্ষার জন্যও প্রয়োজনীয়। চিৎকার করে কাঁদলে যদি শিশু মুখরোচক খাবার পায় তবে সে ক্ষুধা না পেলেও খাবার পাবার আশায় চিৎকার করে কাঁদবে। এভাবে শিশু খাবার পেয়ে অভ্যস্ত হলে অহেতুক আবদার

www.pathagar.com

করার অভ্যাস অপর লোকের কাছে তাকে অপ্রিয় করে তোলে। তাছাড়া আবদার করে কিছু না পেলে শিশু রুষ্ট ও বিস্মিত হয়। জগৎকে সে তার প্রতি সহানুভূতিহীন ও উদাসীন মনে করে। আস্তে আস্তে এরূপ বদঅভ্যাস তার মধ্যে দৃঢ় হয়।

শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার বাসনা থাকে না। তার বাসনা গঠিত হয় কিছু পরে। শিশুকে জন্মলগ্ন থেকেই নৈতিক শিক্ষা দেওয়া দরকার কিন্তু বাসনা গঠিত হবার পর শিশুকে নৈতিক শিক্ষা দিলে একদিকে শিশুর বাসনার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অপরদিকে তার বাসনার ক্ষতি হলে এরূপ অবস্থায় তার মধ্যে ক্রোধের জন্ম হয়।

কখনো শিশুকে অতিরিক্ত আদর করতে নেই। এমনকি অসুখ হলেও না। কারণ অতিরিক্ত আদর পেলে তার মধ্যে আদর পাবার একটি বাসনা জন্ম নিতে পারে। তখন সময় সময় সে আদরের অপেক্ষা করতে থাকবে, কিন্তু আদর না পেলে রুষ্ট হবে।

সুস্থ থাকা প্রত্যেক মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুকে সুস্থ অবস্থায় রাখা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার স্বাস্থ্য বিধানের জন্য যা যা করা প্রয়োজন অভিভাবকদের তা করতেই হবে। শিশুকে ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে রাখা যাবে না। তার জন্য শুকনো ও গরম জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া শিশুর মধ্যে যাতে যৌক্তিক অভ্যাস গঠিত হয় তার জন্য অভিভাবকদের সজাগ থাকা প্রয়োজন। যৌক্তিক অভ্যাস গঠনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে তা দূর করতে হবে বা এড়িয়ে চলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশু ক্ষুধা পেলে বা দৈহিক কোনো কারণে কষ্ট পেলে কাঁদে। আবার দৈহিক কোনো কারণ ছাড়াও শিশুকে কখনো কখনো কাঁদতে দেখা যায়। এরূপ সময়ে শিশুকে কাঁদতে দেয়াই উচিত। শিশুর ঘুমের সময় আসলে মা-বাবাকে ঘুম পাড়ানির গান গেয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এরূপ অভ্যাসের ফলে শিশুর মনে ঘুম পাড়ানি গান শোনার একটা আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিতে পারে। তখন সে গান শুনতে ব্যর্থ হলে রুষ্ট হবে। এভাবে দৈহিক কারণ ছাড়া শিশুকে কাঁদতে না দেয়া এবং ঘুম পাড়ানি গানের অভ্যাস শিশু মনে একটি স্বৈরাচারী ভাবের জন্ম দেয়। শিশুর মনে আত্মপ্রাধান্যের মনোভাব যাতে জন্ম না নেয় তার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। কারণ এগুলো একবার জন্ম নিলে শিশু মনে স্থায়ী রূপ নিতে পারে। শিশুর জন্য অভিভাবক যে কষ্ট স্বীকার করেন তা শিশুকে বুঝতে দেয়া যাবে না। শিশু তার আপন চেষ্টায় সাফল্য লাভ করবে। তাতে সে আত্মতৃপ্তি পাবে এবং আত্মপ্রত্যয় লাভ করবে। বাইর থেকে শাসন শৃঙ্খলা আরোপিত হলে শিশুর মন সংকুচিত হয়। তাই শাসন শৃঙ্খলার ব্যাপারটি যাতে পরিবেশ থেকে শিশুর মনে জাগ্রত হয় তার জন্য অনুকূল পরিবেশে শিশুকে রাখতে হবে।

www.pathagar.com

কষ্ট পেলে শিশু কেঁদে ওঠে। কিন্তু কষ্টের কারণ দূর হলে সে আনন্দ পায়। এভাবে কাঁদার সঙ্গে শিশুর আনন্দের অনুভূতি যোগ হয়। তখন শিশু কষ্ট বা ব্যথা না পেলেও কাঁদে। এই কাঁদার মধ্যে শিশুর আনন্দ পাওয়ার কামনা জড়িত থাকে। তাই শিশুর কাঁদার পেছনে কোন কারণ বিদ্যমান তা বুঝা দরকার। দুটো কারণের (এক. ব্যথা পাওয়ার কান্না। দুই. আনন্দ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে কান্না) ফলশ্রুতিতে কান্নাও দুই ধরনের হয়ে থাকে। তবে দুটো কান্নার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকে যা মা বুঝতে পারেন। মা বুদ্ধিমতী হলে যে কান্নার পেছনে দৈহিক কষ্ট বা ব্যথার সম্পর্ক নেই তা তিনি অবহেলা করবেন।

মানব শিশুর জীবনের প্রথম তিন মাস হলো তার অবসাদ কাল। তখন শিশু আরাম পেলেই ঘুমায়। কিন্তু আরাম নষ্ট হলে জেগে ওঠে। শিশুর ঘুমানোর জন্য তার অবসাদ প্রয়োজন। তাই ঘুমে ব্যাঘাত হতে পারে শিশুর সঙ্গে এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দুই থেকে তিন মাস বয়সকালে শিশু হাসতে শিখে। এই বয়সে শিশু মানুষ ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে। তখন মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও মাকে দেখলেই আনন্দ পায়। এই আনন্দ সে আচরণে প্রকাশ করে এবং মায়ের যে কোনো উদ্যোগে সাড়া দেয়। এই সময় তাকে প্রশংসা করলে আনন্দ পায় এবং নিন্দা করলে লজ্জিত হয়। প্রশংসা ও নিন্দার প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়া খুবই তীব্র হয়। শিশুর জন্মের প্রথম বছর তাকে নিন্দা করা উচিত নয়। আবার প্রশংসা করার সময়ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রশংসা ও নিন্দায় রয়েছে শিশুর জন্য ক্ষতিকর উপাদান। তবে নিন্দার চেয়ে প্রশংসা কম ক্ষতিকর। কাজের জন্য ঘন ঘন প্রশংসা করলে প্রশংসার মূল্য থাকে না। আবার অতিরিক্ত মাত্রার প্রশংসা তার জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু কঠিন কাজ করতে পারলে শিশু যে প্রশংসা পায় তার জন্য পরবর্তী কাজের কৃতকার্যতার জন্য সে উৎসাহ বোধ করে।

নতুন জিনিসের প্রতি শিশুর কৌতূহল প্রবল। নতুন জিনিস দেখলেই শিশু এই জিনিস সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করে। শিশুর এসব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। পিতামাতার উচিত এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং নতুন জিনিসটিকে জানার উপায় সহজ করে দেয়া। শিশু এভাবে একটি জিনিস জানার পর অন্যান্য জিনিস জানার পথে অগ্রসর হয়। এই পর্যায়ে শিশু অনেক বিষয়ে ক্ষমতা অর্জন করে। হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা এবং পেশি নিয়ন্ত্রণে সে নিজের অর্জন দেখতে পায়। নতুন কিছু শেখার মধ্যে শিশু আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার শিশুকে জোর করে কিছু শেখানো উচিত নয়। সব শিশুর বুদ্ধি এক রকম নয়। তাই বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে শেখানো যেতে পারে। কথা বলতে শেখা শিশুর জন্য কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু সে যখন নানা অসুবিধা

www.pathagar.com

অতিক্রম করে কথা বলতে শেখে তখন তার আনন্দের সীমা থাকে না। বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করার মধ্যে শিশু নতুন কিছু জয়ের আনন্দ পায়। এই অনুভূতি তার সারা জীবনের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু অসুবিধা অতিক্রম করে কথা বলতে ব্যর্থ হলে তার শেখার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানব মনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, যে জিনিস অর্জন করা যত কঠিন তা অর্জিত হলে এর জন্য আনন্দানুভূতিও তত বেশি। সহজ অসুবিধাগুলো জয়ের মধ্যে শিশু তেমন আনন্দ পায় না। কিন্তু কঠিন অসুবিধাগুলো জয়ের মাধ্যমে শিশু তার আনন্দ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে আনন্দ বেড়ে গেলে তার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। আবার আনন্দের অভাব হলে সে প্রেরণা হারায়। শিশুর মধ্যে প্রেরণার জন্ম দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শিশুর মধ্যে অনুসরণ করার প্রবৃত্তি প্রবল। অন্যকে কোনো কাজ করতে দেখলে সেও তা করতে চায়। তাকে একবার ঝুমঝুমি বাজিয়ে দেখুন কেমন করে সে আপন চেষ্টায় তা রপ্ত করতে শেখে।

ঘুম, খাওয়া, মলত্যাগ ইত্যাদি প্রাত্যহিক কর্ম সম্পাদনে শিশুর মধ্যে একটি সুশৃঙ্খল অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিশু বড় হতে থাকলে ক্রমেই পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়। তখন চারপাশের বস্তু চিনে নিতে তাকে সাহায্য করা প্রয়োজন। নতুনের প্রতি শিশুর ঝোঁক বেড়ে যায় শৈশবাবস্থার শেষের দিকে। জন্মের প্রথম বছর শিশু অস্বাভাবিক জিনিস দেখলে ভয় পায়। তাই শিশু যাতে ভয় না পায় সেদিকে বয়োজ্যেষ্ঠদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শিশুর অসুস্থতায় অভিভাবকের উদ্বিগ্নতা যেন শিশু বুঝতে না পারে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিশু উত্তেজিত হতে পার এমন কিছুই করা যাবে না।

আজকের শিশু আগামী দিনের বয়স্ক নাগরিক। আজ শিশুর মধ্যে কোনো অভ্যাস ক্রিয়াশীল হলে তা পূর্ণ বয়সকালেও তার চরিত্রে স্থায়ী হতে পারে। ঘুম, খাওয়া ও মলত্যাগের অভ্যাস সুশৃঙ্খলভাবে যাতে শিশুর মধ্যে গড়ে ওঠে সেদিকে নজর দিতে হবে। বয়স্ক অবস্থায় ক্ষতি করতে পারে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য শিশুর চরিত্রে দেখা দিলে তা প্রতিহত করতে হবে।

শিশুর নৈতিক শিক্ষার শেষ বয়স ছয় বছর। বালক বালিকার মধ্যে যেসব গুণ প্রত্যাশিত তা ছয় বছর বয়স কালেই তার মধ্যে বপন করতে হবে। তখন থেকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বিকশিত হয়ে বয়স্ক হলে তাকে সমাজের গুণী মানুষে পরিণত করবে।

শিশুর দ্বিতীয় বছরটি আনন্দের। তখন সে হাঁটতে ও কথা বলতে শেখে। হাঁটার মধ্যে সে নতুন শক্তির সন্ধান পায়। শারীরিক দিক দিয়ে বড় হলে সে খেলাধুলায় মনোযোগী হয়ে ওঠে। সে বাড়ির ভেতরে ও বাহিরে ঘুরে বেড়াতে চায়। তখন সে চারপাশে সব জিনিস দেখার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে। দ্বিতীয় বছরে তার হজম শক্তি আগের বছরের চেয়ে বেড়ে যায়। সে আস্তে আস্তে কোনো

www.pathagar.com

জিনিস চিবিয়ে খেতে পছন্দ করে। ভালো স্বাস্থ্য সাপেক্ষে দ্বিতীয় বছরটি তার জন্য আনন্দময় হয়ে ওঠে।

শিশু হেঁটে বা দৌড়ে স্বাধীনতা অনুভব করে। এই সময় শিশুর মনে ভয়ের জন্ম হয়। উচ্চ শব্দ থেকে ভয় বা উপর থেকে পড়ে যাবার ভয় তাকে পেয়ে বসতে পারে। ভয় প্রবৃত্তিজাত বা ছোঁয়াচে হতে পারে। এক বছর বয়সে যে শিশুটির ভয় ছিল না আজ তার মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হলে কেবল তাকে ছোঁয়াচে বলা ঠিক হবে না। কারণ ভয় প্রবৃত্তিজাতও হতে পারে। সেই প্রবৃত্তিজাত ভয় যে কোনো বয়সে পূর্ণতা পেতে পারে। তাই আমাদের উচিত শিশুর ভয়ের উৎস খুঁজে বের করা। ভয় ছোঁয়াচে হলে, অর্থাৎ অন্যের নিকট থেকে সংক্রমিত হলে তা সহজেই দূর করা যাবে। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত ভয় দূর করার জন্য ব্যাপক পন্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয়।

যে শিশুর বয়স পাঁচ বছরের কম সে কোনো প্রাণিকেই ভয় পায় না। তাই ছোট শিশুর ইঁদুরকে ভয় পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ড. ওয়াটসন ছোট শিশুর মনে ইঁদুরের ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি শিশুটির সামনে ইঁদুর আসা মাত্র বিকট ঘণ্টাধ্বনি সৃষ্টি করতেন। আওয়াজ শুনে শিশু ভয় পেত। সেই ভয় ইঁদুরের উপস্থিতির সঙ্গে মিলে গেলে ইঁদুরের উপস্থিতিও তার জন্যে ভয়ের কারণ হতে শুরু করে। পরে ঘণ্টাধ্বনি না বাজালেও দেখা যেত সে কেবল ইঁদুর দেখলেই ভয় পায়। অনুরূপভাবে অন্ধকারে শিশু ভয় পায় না। কিন্তু বার বার তাকে অন্ধকারে ভয়ের কারণ রয়েছে বললে তার মধ্যে অন্ধকারভীতি দেখা দেয়। অন্ধকারভীতি শিশুর প্রবৃত্তিতজাত নয়। শিশুর ধাত্রী ভীতু হলে শিশুর মধ্যে ভীতি সঞ্চায়িত হতে পারে।

শিশু নতুন জিনিস দেখলে তিন প্রকার অনুভূতি লাভ করে : এক. সে অপরিচিত জিনিসটির প্রতি মোটেও আকৃষ্ট হবে না। দুই. জিনিসটির প্রতি আকৃষ্ট হলেও জিনিসটি তার মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে না। সে জিনিসটি সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। তিন. নতুন জিনিস তার পূর্ব ধারণাকে পাল্টে দিতে পারে। ফলে শিশুর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে এবং পরিণতিস্বরূপ ভয়ের জন্ম দিতে পারে। শিশুর এই ভীতি প্রবৃত্তিজাত এবং তা জীবকুলের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। এই ভীতি প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে সঞ্চারিত হয়।

অস্পষ্ট চলমান ছায়া শিশুমনে ভয় ফেলতে পারে। রাস্তায় চলমান গাড়ির ছায়া দেয়ালে পড়লে তা দেখে শিশু ভয় পায়। এই অবস্থায় শিশুকে নিজের হাতের আঙুলের ছায়া দেয়ালে ফেলে তা চলমান অবস্থায় দেখিয়ে ছায়ার অর্থ বুঝিয়ে দেয়া যায়। এভাবে তার থেকে ছায়াভীতি দূর করা সম্ভব। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে ছায়াভীতি তা শিশুর মন থেকে দূর হলে সে চলমান ছায়া থেকে আনন্দ পেতে শুরু করে। এইভাবে ভয়কে আনন্দে রূপান্তরিত করা যায়।

www.pathagar.com

শিশুদের যে বাসনাগুলো প্রবৃত্তিজাত এইগুলো প্রথমে নির্দিষ্ট আকারে আবির্ভূত হয় না। শিশুর শিক্ষা ও সুযোগ এইগুলোর বিভিন্ন আকার দিয়ে থাকে। শিশুর প্রবৃত্তি কাদামাটির মতো। বিভিন্ন ছাচে কাদামাটি বিভিন্ন আকার নেয়। বিভিন্ন পরিবেশ ও শিশুর প্রবৃত্তিতে বিভিন্ন আকার দিয়ে থাকে। ক্ষেত্র অস্বাভাবিক না হলে মানুষের প্রবৃত্তি উপযুক্ত পরিবেশে বিকশিত হয়ে সৃষ্টির সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়। অসংস্কৃত প্রবৃত্তি মানুষকে ভালো জীবন যাপনে সাহায্য করে না। প্রবৃত্তির স্বার্থে শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া দরকার। এর ফলে শিশু সুস্থ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। প্রবৃত্তিগুলোর সঠিক নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তা মানুষকে ভদ্র জীবন যাপনের উপযোগী করে গড়ে তোলে।

কাজ করে শিশু আনন্দ পায় কেননা কাজ করার মধ্যে ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিশু যে কাজ করে তার ক্ষমতা প্রকাশ করে তা নির্দিষ্ট নয়। শিশু যে কাজই করুক তা যত কঠিন হবে শিশুর আনন্দও তত বেশি হবে। হাঁটার চেয়ে দৌড়ানো কঠিন কাজ। আবার দৌড়ানোর চেয়ে লাফ দেওয়া আরো কঠিন। তাই দেখা যায় শিশু প্রথমে হাঁটতে শিখে যে আনন্দ পায়, দৌড়াতে শিখলে তার আনন্দ বেড়ে যায়। আবার সে যখন লাফ দিতে শেখে তখন তার আনন্দ আরো বেড়ে যায়। শিশু ক্রমাগত কঠিন কাজ রপ্ত করতে পারলে তার আনন্দের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

সৃষ্টি ও ধ্বংস দুটোই কাজ। কিন্তু সৃষ্টি ধ্বংসের চেয়ে কঠিন। বাড়িতে শিশুকে ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে দেখা যায়। কাচের বাসন বা অন্য কোনো ভঙ্গুর জিনিস হাতের কাছে পেলে সে ভেঙে দেয়। এই ভেঙে দেওয়ার মধ্যে তার আনন্দের সূত্রপাত হয়। শিশু নিজ হাতে কোনো জিনিস গড়তেও পারে। তার নিজের হাতে গড়া মাটি বা বালি দিয়ে তৈরি ঢিবি ভেঙে ফেললে সে দুঃখ পায়। তখন শিশুকে একথা বুঝানো যেতে পারে যে তুমি যে কাচের বাসন বা কোনো ভঙ্গুর জিনিস ভেঙেছ তাও কারো না কারোর তৈরি। তোমার তৈরি করা ঢিবি ভেঙে ফেরার জন্য তুমি যেভাবে দুঃখ পেয়েছ সেভাবেই কাচের বাসন ভাঙায় ওই বাসন নির্মাতাও দুঃখ পেয়ে থাকে। এভাবে বুঝিয়ে আমরা শিশুকে ধ্বংসাত্মক কাজের চেয়ে সৃষ্টিশীল কাজের দিকে মনোযোগী হতে সাহায্য করতে পারি।

সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি মনোযোগী হলে সৃষ্ট কাজের মধ্যেই শিশু আনন্দ খুঁজে। এই সময় তার মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটানো যেতে পারে। অপরের সৃষ্ট বস্তু ধ্বংস করলে ওই বস্তুর স্রষ্টা কষ্ট পান– একথা বুঝিয়ে তার মধ্যে ধ্বংস নয়, সৃষ্টির প্রতি তাকে মনোযোগী করে তুলতে পারি। তাছাড়া সৃষ্টি কল্যাণকর ও ধ্বংস ক্ষতিকর ব্যাপারটটি তাকে বুঝানো যায়। ধ্বংস ক্ষতিকর একথাটি শিশুকালে বুঝতে পারলে সে জীবনে কখনো ধ্বংসের দিকে হাত বাড়াতে পারে না।

www.pathagar.com

সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব মানুষের মধ্যে জাগ্রত করা দরকার। কিন্তু কোনো জিনিস তৈরি করাই সৃষ্টিশীল কাজ নয়। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য নাটক, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদি রচনা করাও সৃষ্টিশীল কাজ। শিল্পকলাও সৃষ্টি কাজের অন্তর্ভুক্ত। এসব সৃষ্টিশীল কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষমতা কখনো কখনো সৃষ্টিশীল কাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেতে পারে। রোমের সেনাপতি মার্সেলাস সিসিলি জয় করে সেখানকার বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস আর্কিমিডিসের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আর্কিমিডিসকে নিয়ে আসার জন্য এক সেনা পাঠানো হলো। তখন আর্কিমিডিস সৈকতে বালুর ওপর জ্যামিতির জটিল আঁকিবুঁকি করছিলেন। সেনাটি তাঁকে সেনাপতির ইচ্ছার কথা জানাল। আর্কিমিডিস বললেন, "জ্যামিতিটি শেষ করে নিই।" কিছুক্ষণ পর সেনা হাঁক দিল। বৃদ্ধের জবাব নেই। তারপর সেনাটি আবারো হাঁক দিল। তখনও তিনি জ্যামিতি নিয়ে মশগুল। সেনাটির তর সইল না। সে তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করল। আর্কিমিডিস লুটিয়ে পড়লেন। রক্তের ফিনকিতে নকশাটি ভেসে গেল। যে ক্ষতি হয়ে গেল সেনাটির পক্ষে তা বুঝে ওঠা কঠিন। শিশু বয়সে সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি সংবেদনশীল হলে সারা জীবনের জন্য সে অনুভূতি স্থায়ী হয়। তখন ধ্বংসাত্মক কাজ মানুষের চেতনায় স্থান পেতে পারে না।

শিশু সাধারণত তার চেয়ে কম বয়সের শিশুর খেলনা কেড়ে নেয়। সে নিজের জন্য অপরের চেয়ে বেশি দাবি করে। কমবয়সী শিশু নিরাশ হতে পারে তা সে ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই শিশুর সংযত আচরণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার ওপর চাপ প্রয়োগ করা দরকার। কেননা শিশু বয়সে সংযত আচরণে শিশু অভ্যস্ত হলে পূর্ণ বয়সেও তার চরিত্রে সে বৈশিষ্ট্য বিরাজ করবে। কিন্তু সংযত আচরণ প্রতিষ্ঠার জন্য শিশুকে কিল-চড় দেয়া যাবে না। এর জন্যে অভিভাবকদেরকে কৌশলী হতে হবে এবং ছোট শিশুদের প্রতি বড় শিশুদের সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত করতে হবে।

শিশুকে সংযত আচরণে অভ্যস্ত করার জন্য শিশুর আত্মত্যাগের বিষয়টি নিয়ে কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার আত্মত্যাগের পথে শিশুকে এগিয়ে নেবার একটি অসুবিধা আছে। যার জন্য শিশু নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে, তার প্রতি শিশুর একটি ক্ষোভ মনের গভীরে জমা হতে থাকে। এই সময় স্বার্থপরতা নিজের অজান্তে তার মনে স্থান পায়। তাই আত্মত্যাগ সবার বেলায় প্রযোজ্য হবে না।

পক্ষান্তরে ন্যায় বিচার শিশুর মনে স্থান পেতে পারে। অর্থাৎ ন্যায় বিচারের পথে অগ্রসর হতে শিশুকে উৎসাহিত করা যায়। ন্যায় বিচার আত্মত্যাগের মতো একতরফা স্বার্থ ত্যাগ নয়। ন্যায় বিচারের সাহায্যে সবার স্বার্থ সমানভাবে

www.pathagar.com

বিবেচনা করা হয়। তাই বরং ন্যায় বিচার শিশুমনে স্থান পেলে তা স্থায়ী রূপ নিতে পারে। শিশুর অভ্যাসেও চিন্তায় ন্যায় বিচার সুন্দর জীবন গঠনে সহায়ক।

একটি শিশুর তার সমবয়সী শিশুদের সঙ্গে মেশা উচিত। সমবয়সী শিশুদের সমাজবদ্ধ হবার একটি ভালো দিক রয়েছে। এর ফলে শিশুমনে অনেকগুলো গুণ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। একটি বাড়িতে শিশুটি কেবল তার মাতাপিতার সঙ্গে বাস করতে পারে। এতে সে মাতাপিতার আদেশ পালনে অভ্যস্ত হতে পারে, কিন্তু ন্যায় বিচারে অভ্যস্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সমবয়সী শিশুরা সমাজবদ্ধ হতে পারে। তাছাড়া সে ন্যায় বিচারে অভ্যস্ত হবে। স্বার্থপর হয়ে কোনো শিশুই সমবয়সীদের সঙ্গে সমাজবদ্ধ হতে পারে না। কেননা স্বার্থপরতা নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর না হলেও অপর মানুষের জন্য তা বিরক্তিকর হয়ে দেখা দেয়।

আধুনিকালে ছোট পরিবারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ছোট পরিবারগুলো শিশুদের নিঃসঙ্গ করে ফেলছে। তাছাড়া পিতামাতা জীবিকা অর্জনের তাগিদে বাসাবাড়িতে থাকতে পারছেন না। এমতাবস্থায় শিশুদের মধ্যে সঙ্গ লাভের একটি ভালো উপায় হতে পারে নার্সারি স্কুল। সেখানে শিশুরা পারস্পর মিলে লেখাধুলা করতে পারে। শিশুদের পারস্পরিক খেলাধুলায় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। তখন শিশুরা তাদের মধ্যকার সমস্যার সমাধান নিজেরাই খুঁজে বের করবে। এই সমাধান খোঁজার মাধ্যমে তাদের মধ্যে ন্যায়বোধ জাগ্রত হবে যা তাদেরকে সমাজের উপযুক্ত মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

কোনো পরিবারের দুটি সমবয়সী শিশুর বয়সের পার্থক্য খুব বেশি না হলে তাদের রুচিও প্রায় একই হবে। সেই পরিবারের কেবল এক সেট খেলনা থাকলে একটি শিশুই খেলনা নিয়ে খেলতে পারবে। প্রথমে দুটো শিশুই খেলনায় তাদের স্ব স্ব অধিকার পেতে চাইবে। এক্ষেত্রে পরিবারের বয়স্ক সদস্যগণের দায়িত্ব হবে তাদের বুঝিয়ে দেয়া যেন পালাক্রমে তারা উভয়েই তা ব্যবহার করতে পারবে। এক্ষেত্রে দুটি শিশু বয়োজ্যষ্ঠদের সাহায্যে ন্যায় বিচারে অভ্যস্ত হবে। ন্যায় বিচার শিশুর সহজাত গুণ নয়। কিন্তু শিশুরা তা সহজে আয়ত্ত করতে পারে।

সাধারণত শিশু কোনো জিনিস নিজ অধিকারে রাখতে চায়। নিজ অধিকারে তার প্রত্যাশিত জিনিস রেখে শিশু আত্মপ্রসাদ লাভ করে। শিশুর এজাতীয় মনোভাবের ভালো-মন্দ দুটি দিকই আছে। নিজ অধিকারে রাখায় সে অতিরিক্ত উৎসাহ পেলে আত্মস্বার্থ হাসিল করার দিকে মনোযোগী হবে। এভাবে তার চর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে সে নিরুৎসাহিত হবে। অতিরিক্ত শাসন তার আত্মবিকাশের পথ রোধ করে দেবে। এক্ষেত্রে শিশুর সঙ্গে আচরণে কোনো বাধাধরা নিয়ম মেনে চলা ঠিক হবে না। শিশুর প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে আচরণের নিয়ম ঠিক করতে হবে। আচরণের সঠিক নিয়ম শিশুর আত্মবিকাশের অনুকূল হবে। কিন্তু

www.pathagar.com

আচরণে কোনোরূপ ভুল হলে শিশুর মানসিক বিকাশ স্বাভাবিক না হয়ে রুদ্ধ হতে পারে।

সম্পদের প্রতি শিশুর আকর্ষণের ব্যাপারটিকে সঠিকভাবে দেখা প্রয়োজন। সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ শিশুকে পরিণত বয়সে দুর্বিপাকে ফেলতে পারে। কোনো কারণে তার সম্পদ হারানো গেলে সে তা সহ্য করতে পারবে না। পরিণতিস্বরূপ তার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা দেখা দেবে। সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কলহে জড়িয়ে পড়বে। তার জীবন তখন বিভীষিকাময় হয়ে উঠবে। তাই সম্পদের ওপর তীব্র অধিকারবোধ যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

হাতের নাগালের ভেতর কোনো বস্তু শিশুর দৃষ্টিগোচর হলে তার হাত ও চোখের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। চোখ ও হাতের এই সম্পর্ক শিশুর অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়। শিশুর হাত থেকে কোনো জিনিস কেড়ে নিলে শিশু রাগান্বিত হয়। কিন্তু জিনিসটি ধরে রাখতে পারলে সে তার যত্ন নিতে শেখে। ফলে তা ধ্বংস করতে চায় না। শিশু কোনো জিনিস প্রস্তুত করতে পারলে তার প্রতি মমতা অনুভব করে। প্রস্তুতকৃত জিনিস নিয়ে সে গর্ববোধও করে। সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে শিশুর সৃষ্টিশীল আবেগ নষ্ট হয়ে যায়। তাই দেখা যায় সম্পদের ওপর শিশুর অধিকারের ভালোমন্দ দুটো দিকই রয়েছে। একে উৎসাহিত করা ক্ষতিকর। আবার তা দমন করাও ঠিক নয়। এর জন্যে শিশুর সঙ্গে বয়স্ক লোকের আচরণে যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে সে দিকে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

www.pathagar.com

শিক্ষায় স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা

শিক্ষার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। প্রথম তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষায় শিক্ষার্থীর ক্রমাগতভাবে উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এই সুযোগ সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়াতে পারে এরূপ প্রভাব দূর করা। দ্বিতীয় তত্ত্ব অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য প্রতিটি ব্যক্তিকে সংস্কৃতিবান করে গড়ে তোলা এবং ব্যক্তির মধ্যে সর্বোচ্চ দক্ষতা বিকশিত হবার পথ সহজ করে দেয়া। তৃতীয় তত্ত্ব অনুসারে গোটা সমাজের মানুষই শিক্ষার লক্ষ্য, বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তি নন। গোটা সমাজের সব মানুষকে কাজের মানুষে পরিণতি করে সুন্দর সমাজ গঠন করা।

বর্ণিত তত্ত্বগুলোর কোনো একটি তত্ত্বও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সব তত্ত্বগুলোর ভালো ভালো দিক একটি বিশেষ অনুপাতে গ্রহণ করলে তা সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হবে। আমরা দেখেছি যারা রাজনৈতিক উদারতত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাদের অবস্থান বাধ্যতামূলক শিক্ষার পক্ষে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

অনেকেই মনে করেন শিশুদের সঠিক জীবনযাপনের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। নৈতিক শিক্ষা পেলে এবং কঠোর শ্রমদানে অভ্যস্ত হলে শিশু জীবন সংগ্রামে জয়ী হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা রূঢ় হতে বাধ্য। ঘোড়াকে চাবুক মেরে সঠিক পথে চালাবার মতোই শিশুর প্রতি লাঠির ব্যবহার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছার সুযোগ করে দেয়। ব্যবস্থাটি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ না হলেও এখানে চিন্তার বিষয় রয়েছে।

এক সময় রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি আন্দোলনের সূচনা করে। এই আন্দোলন ছিল ইচ্ছাশক্তির ওপর অযথা গুরুত্বারোপের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ। শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন কিছুটা সফল হয়। কিন্তু শিক্ষা কর্মকর্তাগণ তাদের কর্তৃত্ব আরোপের দিকে অবিচল ছিলেন। রোমান্টিক বিনম্র আচরণ গ্রহণ করতে এই কর্তা ব্যক্তিগণ ইচ্ছুক ছিলেন না বটে। তথাপি শিক্ষা তত্ত্বের ওপর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাব ফেলে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সর্বাধিক স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তিটি অত্যন্ত প্রবল। শিশু কিছু করতে বাধ্য হলে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং ঘৃণা প্রকাশ করে। ঘৃণা প্রকাশে

www.pathagar.com

স্বাধীনতা থাকলে ভালো, না থাকলে তার নিজের ভিতর তা আন্দোলিত হতে থাকে এবং এক সময় মনোজগতের অবচেতন স্তরে চলে যায়। ফলে সারা জীবন শিশুটি অদ্ভুত ফল ভোগ করে। এই নির্যাতিত শিশুটি সাবালক হবার পর অন্য শিশুদেরকে নির্যাতিত করার বাসনা পোষণ করে। সমাজে এ জাতীয় ঘটনার ব্যাপকতা সার্বিক বিষণ্নতার জন্ম দেয়।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার একটি ক্ষতিকর দিক এই যে এতে মৌলিক চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে আগ্রহে ভাটা পড়ে। শিশুদের মনে জ্ঞান পিপাসা স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকে না। কিন্তু শিশুকে তার আকাঙ্ক্ষার অতিরিক্ত কিছু শিখতে বাধ্য করা হলে জ্ঞান পিপাসা নষ্ট হয়ে যায়। কোনো শিশুকে জোর করে কোনো খাদ্য খাওয়াতে চাইলে সেই খাদ্যের প্রতি শিশুর অভক্তি দেখা দেয়। অনুরূপভাবে শিশুর ইচ্ছার অতিরিক্ত কিছু শিখতে বাধ্য করা হলে শিক্ষার প্রতি তার বীতশ্রদ্ধ ভাব দেখা দেয়। কিন্তু পড়াশুনার ব্যাপারটি শিশুর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলে অনেক বিপদ এড়ানো সম্ভব। এতে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় না। শিক্ষক যা শেখান ছাত্র তা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

সংস্কারপন্থী শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। বিদ্যালয়ে স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই একথা ঠিক নয়। এই নীতির সীমাবদ্ধতা অনেক।

ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সন্তান অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন থাকে। পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্যকর। অভিভাবকরা একে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। দুটি শিশুর একটি পরিচ্ছন্ন ও অপরটি নোংরা হলে পরিচ্ছন্ন শিশুর অভিভাবক নোংরা শিশুর অভিভাবকের চেয়ে খুব বেশি আয় করেন বলে ধরে নেয়া হয়। নোংরা শিশুর অভিভাবক দরিদ্র। নোংরা ও পরিচ্ছন্ন শিশুর এই পার্থক্য অভিভাবকের একটি দলকে তাদের শিশুদের পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। এটা সন্তানের প্রতি অত্যাচার। এই কাজে তাদের সময় ব্যয় হয়। তাছাড়া অনেক ভালো কাজ করার সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যায়। স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করলে একটি শিশুকে দিনে দুবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা দরকার। একবার ঘুম থেকে ওঠার পর। আরেকবার ঘুমাবার পূর্বে। মাঝখানে বিরাট সময় ধুলার পৃথিবীতে সে ছুটে বেড়াবে, ধুলো কাদায় খেলবে। শিশুদের ছুটে বেড়ানো ও খেলায় আনন্দ বেশি। এই আনন্দ থেকে তাদের বিরত রাখলে অনুপ্রেরণা ও প্রবর্তনা হারাবে। পেশি শক্তির ব্যবহারেও অনভ্যস্ত হয়ে উঠবে। সকাল সন্ধ্যা দুবেলা পরিচ্ছন্ন করতে যে সময় লাগে তারা যে সময়টুকু দিতেও নারাজ। কিন্তু প্রয়োজনে জোর করেও তখন তাদের পরিচ্ছন্ন হতে রাজি করাতে হবে।

শিশু-কিশোরদের জন্য সময়নিষ্ঠ হওয়া দরকার। স্বাধীন শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় এই গুণ অর্জন করা যায় না। সামাজিক সহযোগিতার জন্য সময়নিষ্ঠ

www.pathagar.com

হওয়া জরুরি। সময়নিষ্ঠ না হলে অর্থনৈতিক কাঠামা ভেঙে পড়তে পারে। যাদের চরিত্রে খামখেয়ালিপনা রয়েছে তারা সময়নিষ্ঠ হতে পারে না। এ জাতীয় লোকের কোনো বড় কাজ করতে না পাবার কারণ এটাই। তরুণদের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

মানুষের সাধু স্বভাব একটি বিশেষ গুণ। এরূপ স্বভাবের মানুষ অপরের সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন। সাধু স্বভাব স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। বিশৃঙ্খল চরিত্রের মানুষ বিপদের ভয় না থাকলে অপরের সম্পদ হরণ করে। এমনকি যারা সময়নিষ্ঠ তারাও সুযোগ পেলে চুরি করে। যারা চুরি করে তারা জানে যে চুরি করা সব সময় নিরাপদ নয়। এক ধরনের চুরিকে ছেচড়া চুরি বলে। ছেচড়া চুরির বৈশিষ্ট্য এমন যে চোর বিনা প্রয়োজনেও কোনো কিছু চুরি করে বসে। ছেচড়া চুরির গভীর মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শাস্তির ব্যবস্থা করে ছেচড়া চুরি বন্ধ করা যায় না। কিন্তু সাধারণ চুরি কোনো অযৌক্তিক ঘটনা নয়। যৌক্তিক বলেই একে জরিমানার ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব। চোরের স্বার্থে চৌর্যকাবৃত্তির ঘটনা বড়দের মোকাবেলা করা প্রয়োজন। কিন্তু চৌর্যবৃত্তির ঘটনা মোকাবেলা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ছেলেরা চোরের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে না পারে।

তরুণদের জীবনে রুটিন বেঁধে চলার গুরুত্ব রয়েছে। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলে চলবে না। তবে এ রুটিন অপরিবর্তনীয় ও শর্তহীন হবে– এমন নয়। রুটিনের পরিবর্তন তরুণরা প্রত্যাশা করতে পারে। অনিশ্চিত জীবন ক্লান্তিকর। বিশেষত তরুণদের জন্য ক্লান্তির তো বটেই। প্রতিদিনের ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে পারলে শিশুরা নিরাপদ বোধ করে। প্রত্যেক শিশুই চায় তার জীবন নিরাপদ হোক। অভিযানপ্রিয়তা এবং দুঃসাহস খুব ভালো গুণ। কিন্তু গুণগুণ অর্জন করার জন্য নিরাপদ পরিবেশে বাস করা প্রয়োজন।

রুটিনের আরো একটি দিক ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রত্যেক শিশু নিজের কাজ নিজে নির্বাচন করে। তাছাড়া কাজ নির্বাচন করা তাদের কাছে ক্লান্তিকর। শিশু মোটেই কামনা করে না যে সে উদ্যোগী হয়ে কাজ করবে। বন্ধুভাবাপন্ন বয়স্ক লোক যে কাঠামো তৈরি করে তার মধ্যে শিশু নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। দুরূহ কাজ করা বড়দের কাছে কৃতিত্ব বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে শিশুরা দুরূহ কাজ করে ফেললে তা কৃতিত্ব মনে করে উপভোগ করে। এই কৃতিত্ব অর্জন করার বিষয় এবং তা অর্জন করার জন্য দরকার নিজের নিরন্তর প্রচেষ্টা। কিন্তু উৎসাহ ও সহায়তা ছাড়া এটা করা যায় না। সব সময় সঠিকভাবে চলার সামর্থ্য অর্জন করা মূল্যবান গুণ। তরুণেরা এই গুণ সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়। অনঢ় শৃঙ্খলা বা অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে এই গুণ অর্জন করা যায় না। বাইরের প্রেরণা ও নির্দেশনা পেলে শিশু কাজ করতে সমর্থ হয়। কিন্তু শৈশবে পূর্ণ স্বাধীনতা পেলে

www.pathagar.com

তার পক্ষে আবেগ উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। পূর্ণ স্বাধীনতায় তারা বিমল আনন্দে মত্ত হয়। ফলে অবসন্নতা তাদের পেয়ে বসে এবং কোনো কাজ করতে দেয় না। ইচ্ছা শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য দরকার নির্দিষ্ট অনুপাতে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা। এগুলোর কোনো একটি পরিমিত মাত্রার চেয়ে বেশি হলে অনিষ্ট অনিবার্য।

শিশুকে প্রশিক্ষিত করার জন্য তার ইচ্ছার সহযোগিতা লাভ করা দরকার। এই দিক দিয়ে শৃঙ্খলায় বাঞ্ছিত মাত্রা বুঝতে হবে। যে শিশু বয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে বাস করে সে নিজেকে বোকা মনে করে। সে বয়স্ক লোকদের আদেশ নিষেধ আন্তরিকভাবে মেনে চলে। শিশুর কাছে উপদেশদাতার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকতে হবে। তাছাড়া উপদেশদাতা যে তার কল্যাণ চান সে ব্যাপারে শিশুর বিশ্বাস থাকতে হবে। শিশুকে বিশ্বাস করতে হবে যে উপদেশদাতা নিজের সুবিধার জন্য বা ক্ষমতা খাটানোর জন্য উপদেশ দিচ্ছেন না। ক্রীড়াবিদগণ জয়লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে শৃঙ্খলা মেনে চলেন। শিশুরও বুদ্ধিজীবী হিসেবে যশ কুড়াবার বাসনা ক্রীড়াবিদদের মতোই তীব্র। ফলে সে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা মেনে চলার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। তরুণদের সামনে দুরূহ সাফল্যের আদর্শ তুলে ধরতে হবে। নতুবা তারা অযোগ্য ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়বে। কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা অবাধ সেখানে কারো মনে বিষয়টা জাগবে না।

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, যে ধরনের শৃঙ্খলা থাক না কেন এর সঙ্গে সামান্য আবেগগত নিয়ন্ত্রণ যুক্ত করা যেতে পারে। তবে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চলবে না। যদি শিশু মনে করে তার কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তাহলে তার চরিত্রে অবাঞ্ছিত উপাদান ঢুকে যেতে পারে। এই উপাদানের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে শিশুর চরিত্রের দৃঢ়তার ওপর। এই শৃঙ্খলা ছাড়া চলবে না। কিন্তু মার্জিত রুচিশীল যোগ্য মানুষ গড়ার স্বার্থে শৃঙ্খলা যতটা সম্ভব কাটছাঁট করতে হবে।

বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ জ্ঞানানুসন্ধান ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায় আন্তরিক হলে এবং শিক্ষকগণ সহানুভূতিশীল হলে তারা দক্ষতা ও বুদ্ধি দিয়ে কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই শিক্ষাদান করে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ তৈরি করতে পারেন। কোনো শিশুকে গণ্ডগোল করতে দেখলে তাকে ক্লাসরুমের বাইরে এনে বলতে পারেন, যাও কোথাও গিয়ে খেলা করো। সাধারণ স্কুলগুলো এই শর্ত তাড়াতাড়ি পূরণ করতে পারবে না। তাই বর্তমান অবস্থায় ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের ভূমিকা

স্কুলের প্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী। তাদের হাতে রয়েছে মানুষ গড়ার কৌশল। স্কুলের জন্য বিল্ডিং তৈরি করাসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ করার পর একদল অযোগ্য শিক্ষকের হাতে শিক্ষার ভার তুলে দিলে এরা কোনোদিনই ছাত্রদের সফল হতে সাহায্য করতে পারবে না। আমাদের দেশের পল্লি অঞ্চলে যেসব স্কুল রয়েছে ওইগুলোর অবস্থা কেমন তা বুঝার জন্য আমি একটি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের কাছে স্কুলের অবস্থা জানতে চাই। তারা স্কুলের ভবনগুলোর দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন এই স্কুলটি অন্য দশটা স্কুলের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আমি তাদেরকে বলি বিল্ডিং দিয়ে স্কুল কেমন চলছে বুঝানো ঠিক নয়। স্কুলের পড়াশুনার মান দিয়ে স্কুল কেমন চলছে বুঝতে হবে। একজন শিক্ষিত লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারবেন স্কুলটিতে কেমন লেখাপড়া হয়। তখন কেবল তিনিই বলতে পারবেন স্কুলটির লেখাপড়ার মান কেমন। কিন্তু আমজনতা কীভাবে জানবে স্কুল কেমন চলছে? আমজনতা স্কুলের লেখাপড়ার মান পাবলিক পরীক্ষায় স্কুলের ফলাফল দিয়ে বিচার করে। আমি দু-একটা স্কুলের শিক্ষকদেরকে তাদের ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখেছি তারা বোর্ডের পাসের হারের সাথে স্কুলের পাসের হার তুলনা করেন। এই পাসের হার তুলনা করে তারা লেখাপড়ায় স্কুলের মান ভালো বুঝাতে চান। আমি তাদের বলি বোর্ডের পাসের হার উল্লেখ করার পাশাপাশি ছাত্রদের প্রাপ্ত গ্রেডেরও একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়। এই দিকটি বিবেচনায় রেখে এবার বলুন গোল্ডেন A+, A+ ও A এর দিক থেকে আপনার স্কুলের অর্জন কী হয়েছে? তখন তারা কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। আমি আরও জানতে চাই তাদের স্কুল থেকে এস.এস.সি পাস করে বৃহত্তর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে ছাত্ররা কে কোথায় কী অর্জন করেছে? সেই সময়ও শিক্ষকগণ নীরবতা পালন করেন। তখন আমার বুঝতে বাকি থাকে না যে ওই স্কুলগুলো ভালো চলছে না। আমি তখন একটু কৌতূহলী হয়ে জানতে চাই স্কুলে ইংরেজি- বাংলা-গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে যে শিক্ষকগণ পড়ান তাদের যোগ্যতা কতটুকু? যোগ্যতার প্রশ্নে অনেকেই

www.pathagar.com

শিক্ষকদের বিএড/এমএড ডিগ্রির দিকে দৃষ্টি দিতে চান। বিএড/এমএড ডিগ্রি শিক্ষকদের এক ধরনের যোগ্যতার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি। কিন্তু এই ডিগ্রিই ভালো শিক্ষক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কোনো শিক্ষক যে বিষয় পড়ান সে বিষয়ে তার পুরোপুরি জ্ঞান না থাকলে বিএড বা এমএড ডিগ্রি দিয়ে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের অভাব পুষিয়ে নিতে পারবেন না। ভিটামিন খাদ্যবস্তু নয়। কিন্তু তা খাদবস্তুকে শরীরে ক্রিয়াশীল করতে সাহায্য করে। বিএড বা এমএড কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের যে জ্ঞান দেওয়া হয় তা স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয় নয়। তবে তা শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান বিনিময়ে শিক্ষককে শক্তি যোগায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিষয়ের জ্ঞানে সমৃদ্ধ না হলে যা বিনিময় প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীর কাছে যাবে তার অভাব থেকে ওই (বিএড/এমএড) শক্তির উপস্থিতি সত্ত্বেও শিক্ষকের দারিদ্র্যই প্রকাশ পাবে। তিনি সফল হতে পারবেন না। শিক্ষক ছাত্রদের যে বিষয় পড়াবেন সে বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষককে যথাযথ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তিনি কী পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করে সেই জ্ঞান ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করবেন তা পরের বিষয়। একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের দীনতা তাদেরকে জ্ঞান বিতরণে অসহায় অবস্থায় ফেলে দেয়। আমি আমার চাকরিকালীন ও চাকরি পরবর্তী সময়ে কয়েকটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যা জ্ঞানের রাজ্যে আমাদের দৈন্য দশাকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমি নিম্নে এগুলোর কিছু বিবরণ দিলাম।

প্রথমে আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করতে চাই তা বছর তিনেক আগের। একটি বিভাগীয় শহরের অভিজাত পাড়ায় অবস্থিত একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজ। প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ আমার পরিচিত। বছর তিনেক আগে একদিন আমি প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের কক্ষে আলাপচারিতায় রত ছিলাম। এমন সময় একজন লোক অভিভাবক হিসেবে অধ্যক্ষ সাহেবের কক্ষে ঢোকেন। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন "আমি তেরো বছর বয়সে ইংল্যান্ড গিয়েছিলাম। তাই পড়াশুনা করতে পারিনি। সাহিত্যের প্রতি আমার ঝোঁক আছে। তাই নিজ আগ্রহ থেকে নাটক উপন্যাস পড়ি। ইংরেজদের দেশে বাস করি বলে কিছুটা ইংরেজি জানি।" নিজের সম্পর্কে এরূপ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার পর তিনি অধ্যক্ষ সাহেবকে লক্ষ্য করে বলেন, "আপনার প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমার এক ভাতিজা পড়ে। ইংরেজির শিক্ষক বাড়ির কাজ হিসেবে তাকে দশটি বাক্য লিখে আনতে বলেন। আমার ভাতিজা যে দশটি বাক্য লিখেছিল এর কোনো একটি বাক্যও শুদ্ধ ছিল না। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তার লেখা পাঁচটি বাক্য সঠিক বলে চিহ্নিত করেন। আমার বিশ্বাস যিনি ইংরেজি পড়ান তিনি নিজেই ইংরেজি জানেন না। অধ্যক্ষ সাহেব উপাধ্যক্ষ সাহেবকে বিষয়টি দেখার জন্য বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে উপাধ্যক্ষ সাহেব সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে নিয়ে অধ্যক্ষ সাহেবের রুমে

www.pathagar.com

ঢোকেন। ওইদিন আমি পুরো ব্যাপারটি প্রত্যক্ষ করি। আমার বলতে দুঃখ হয় যে শিক্ষকের ভুল ইংরেজি জ্ঞান তার কাথাবার্তার মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটি বর্ণনা করতে চাই তা প্রায় দশ বছর আগের। আমার ছোট মেয়ে তখন শহরের একটি ভালো স্কুলে পড়ে। এক ছুটির দিনে আমি বাসায় ছিলাম। ওইদিন আমার মেয়ে এসে বলল, "আব্বু, তোমার কাছে আমার কয়েক সহপাঠী পদার্থবিদ্যার একটি বিষয় বুঝতে চায়। আমি কি তাদের আসতে বলব? একজন শিক্ষক হিসেবে আমি মনে করি আমার নিজস্ব গণ্ডির ভেতর পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝানোই আমার কাজ। তাই আমার মেয়েকে বললাম, 'তুমি তাদের তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো।' পাঁচ-ছয়টা মেয়ে। আমি আমার বেড রুমের খাটের ওপর বসা ছিলাম। মেয়েগুলো রুমে ঢুকেই খাটের পিছনের অংশ তিন দিক থেকে ঘিরে মেঝের ওপর বসে পড়ল। যে বিষয়টি তাদের বুঝার প্রয়োজন ছিল বই খুলে তা তারা আমাকে দেখিয়ে দিল। আমি আমার সাধ্যমতো বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি। বিষয়ের ওপর আমার কথাবার্তা শেষ হলে আমি তাদেরকে বিষয়টি বুঝাতে পেরেছি কি না জিজ্ঞাসা করি। তারা সবাই বুঝতে পেরেছে– বলল। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক স্কুলের ক্লাসে বিষয়টি যখন বুঝাচ্ছিলেন তখন তাদের না বুঝার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা একযোগে বলেছিল, "আপা তো আমাদের বুঝান না।" "আপা তাহলে কী করেন?" জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেছিল," আপা আমাদের দিয়ে রিডিং পড়ান।" পদার্থবিদ্যা এমন একটি বিষয় যা পড়ার সময় বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝার দিকে নজর দিতে হয়। স্কুল জীবনে পদার্থবিদ্যার বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বুঝার জন্য শিক্ষকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। এখানে শিক্ষক ছাত্রদের দিয়ে রিডিং পড়িয়ে তার দায়িত্ব শেষ করলে ছাত্র/ছাত্রী কীভাবে পদার্থবিদ্যার মতো কঠিন বিষয় নিজেরা আয়ত্ত করতে সক্ষম হতে পারে– আমি বুঝি না।

তৃতীয় ঘটনাটি একটি অনার্স মাস্টার্স টিচিং কলেজের। আমি তখন এমসি কলেজে সহযোগী অধ্যাপকের পদে কাজ করছিলাম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগপত্র পেয়ে আমারই বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপকসহ ওই কলেজে মাস্টার্স ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যাই। মৌখিক পরীক্ষায় একটি ছেলেকে খুব গুরুত্ব না দিয়েই একটি প্রশ্ন করেছিলাম। প্রশ্নটি খুব সহজ বলেই আমি তেমন গুরুত্ব দেইনি। নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন কোনোরূপ বন্ধন ছাড়া বাহিরের দিকে চলে যাবার কথা। বৃত্তাকার পথে ঘূর্ণায়মান বস্তু মুক্ত করা হলে স্পর্শকের দিক অনুসরণ করে তা বাহিরের দিকে চলে যায়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পদার্থ বিজ্ঞান থেকেই ছাত্ররা এই জ্ঞান অর্জন করে আসে। কিন্তু একটি বিশেষ বলের জন্য ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের দিকে আকর্ষিত হয়ে থাকে। ওই বিশেষ বলটির নাম বলার জন্য আমি ছেলেটিকে প্রশ্ন

www.pathagar.com

করেছিলাম। ছেলেটি উত্তর দিতে পারছিল না। তখন ওই কলেজের আমার বয়সী একজন শিক্ষক ছেলেটিকে সাহায্য করার জন্য দুটি বিপরীতধর্মী চার্জের মধ্যকার বল কী হতে পারে– জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেটি তাৎক্ষণাৎ "বিদ্যুতিক বল" বলে উত্তর করল। আমি বলতে অস্বস্তি বোধ করলেও সত্য বিষয়টি পাঠকের কাছে বোধগম্য করার জন্যই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সেই শিক্ষক ওই ছাত্রকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যুতিক বল বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিলেন। বিষয়টি সহজ করার জন্য আমাকে বলতে হয় যে স্থির দুটি চার্জের মধ্যকার বলের নাম "বৈদ্যুতিক বল" যা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের আলোচ্য বিষয়। মাস্টার্স পরীক্ষায় এই বল সম্পর্কে প্রশ্ন করা অর্থহীন। প্রশ্নটি ছিল ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের ওপর কার্যকরী বল সম্পর্কে যা স্থির চার্জ সম্পর্কিত নয়। এক্ষেত্রে ওই শিক্ষক কীভাবে আলোচনায় "বৈদ্যুতিক বল" নিয়ে এসেছিলেন? অনেক আগেই ম্যাক্সওয়েল বৈদ্যুতিক বল ও চুম্বকীয় বল একীভূতকরণের কাজটি করে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বলের ধারণা স্পষ্ট করেছিলেন। তাই এক্ষেত্রে তিনি কেন বৈদ্যুতিক বলের দিকে ছেলেটির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন– তা ভেবে দেখার বিষয়।

চতুর্থ ঘটনাটি আমার চাকরি জীবনের মাঝামাঝি সময়েরও কিছু পরের। আমি পর পর চার বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান ও মাস্টার্স স্তরের পরীক্ষা কমিটির সদস্য ছিলাম। একবার সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা কমিটির সদস্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম পরীক্ষা কমিটির সভাপতি একটি বিখ্যাত কলেজের পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধানকে করা হয়েছে। কমিটির প্রথম সভায় সভাপতি আমাকে আমার কলেজের কোনো শিক্ষককে দিয়ে একটি পেপারের প্রশ্ন করিয়ে দেবার দায়িত্ব দেন। আমি একজন ভালো শিক্ষককে দিয়ে প্রশ্ন প্রস্তুত করে কমিটির দ্বিতীয় সভায় উপস্থাপন করি। দেখা গেল প্রশ্নকর্তা গতানুগতিক ধারার প্রশ্নই করেছেন। তবে একটি প্রশ্নের অংশ বিশেষে তিনি গতানুগতিকতার বাইরে চলে যান। স্রেফ মেধা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি সেই প্রশ্নের সঙ্গে একটি অংশ যোগ করে দিয়েছেন যার উত্তর একটু সিরিয়াস না হলে কেউ লিখতে পারবে না। সভাপতি প্রশ্নের ঐ অংশটুকু দেখে এর সঠিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। আমি প্রশ্নটি যে সঠিক সে বিষয়ে সভাপতিকে নিশ্চয়তা দিই। কিন্তু তার পরও তিনি বলেন, যে প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি নিজেই জানেন না সেই প্রশ্নের উত্তর ছাত্ররা লিখবে কীভাবে? তিনি নিজে নিজেই বলেছিলেন, যে প্রশ্নের উত্তর ছাত্ররা লিখতে পারবে না তা প্রশ্নেপত্রে অন্তর্ভুক্ত না করাই ভালো। সাধারণ ছাত্রদের থেকে ভালো ছাত্রদের মেধা যাচাইয়ের জন্য এরূপ প্রশ্নের গুরুত্ব বিবেচনায় রাখা দরকার। তাই আমি তাকে ওই আংশিক প্রশ্নটি প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে অনুরোধ করি। কিন্তু সভাপতি তার আপন ক্ষমতাবলে সেই অংশটুকু বাদ দিয়েই আমার সহকর্মীর বাকি প্রশ্নগুলোর পুরোটাই প্রশ্নপত্রে রেখে দেন। আমার সহকর্মী

www.pathagar.com

মেধাবী ছাত্র ছিলেন। সে অর্থে ভালো শিক্ষকও। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার পর প্রশ্নকর্তা (আমার সহকর্মী) তার ধার্য করা সবগুলো প্রশ্ন নির্বাচিত হয়েছিল দেখে আনন্দিত হন। সঙ্গে সঙ্গে তার পছন্দের মেধা যাচাইয়ের অংশটুকু (মূল প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করা যেত) না দেখে আমার কাছে তার কারণ জানতে চান। আমি তাকে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেই। বিবরণ শোনার পর তার মন্তব্য ছিল: "ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেই সবগুলো প্রশ্ন নির্বাচন করলে ভালো হতো।" আমি আজও চিন্তা করি কেন সভাপতি প্রশ্নের আলোচিত বিশেষ অংশ (যা প্রশ্নপত্রে অন্তর্ভুক্ত করেননি) নিজেই জানেন না, বললেন। প্রশ্নের বিষয়বস্তু সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার ধারণা একজন গড়মানের শিক্ষকের তা জানা উচিত।

উপরের বর্ণিত ঘটনাগুলো শিক্ষকদের মান সম্বন্ধে আমাদের নেতিবাচক ধারণা দেয়। এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষকদের মানের ইতিবাচক ধারণা পাওয়া যাবে না। প্রকৃত সত্য এই যে, শিক্ষকদের মানের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ধারণা দুটোই বিদ্যমান। ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতিবাচক দিক ভারী হলে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো কঠিন হবে। কলেজ শিক্ষকদের সম্পর্কে বাংলাদেশের সদ্য প্রয়াত জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ "আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই" নামক আত্মজীবনীমূলক বইতে উল্লেখ করেছেন: "কলেজ শিক্ষকদের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি বড় ধরনের প্রভেদ প্রথম দিনেই স্পষ্ট হয়ে গেল। কলেজের স্যাররা যখন পড়াতেন তখন মনে হত, যে বিষয়টি তারা পড়াতেন সে বিষয়টি নিজেরা ভাল করে জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যারেরা দেখলাম শুধু যে জানেন তা নয়, এত ভাল করে জানেন যে ছাত্র হিসেবে ভয় ধরে যায়।" তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত রসায়নের একজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে তার জ্ঞান সম্পর্কে নিজের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। যাহোক আলোচনায় সর্বস্তরের শিক্ষাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। একজন শিক্ষক আমাদের সমাজে সম্মানিত মানুষ। মানুষ কেন তাকে সম্মান করে তা ভেবে দেখার বিষয়। থানার ওসিকে মানুষ ভয় পায়। কারণ তার হাতে ক্ষমতা রয়েছে। ব্যাংকে লক্ষ কোটি টাকা জমা রাখতে কখনো কেউ দ্বিধাবোধ করে না। কারণ ব্যাংক এর সততায় মানুষের বিশ্বাসে কখনো আঘাত করে না। একইভাবে শিক্ষক সমাজে সম্মানিত। কারণ মানুষ জানে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন। ওসির ক্ষমতা না থাকলে মানুষ তাকে ভয় করবে না। ব্যাংক এর সততায় মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করলে টাকা পয়সা জমা রাখার জন্য মানুষ ব্যাংকে যাবে না। অনুরূপভাবে শিক্ষক জ্ঞানের দিক দিয়ে দুর্বল হলে মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাবার আশা করতে পারেন না।

জ্ঞান শিক্ষকের প্রধান সম্পদ। কিন্তু একজন শিক্ষকের পক্ষে দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। শিক্ষক কী জ্ঞান এবং কতটুকু জ্ঞান অর্জন

www.pathagar.com

করবেন? অর্থাৎ কতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে আমরা একজন শিক্ষককে জ্ঞানের দিক দিয়ে দরিদ্র মনে করব না। শিক্ষকের পেশা তার যতটুকু জ্ঞান দাবি করে তিনি ন্যূনতম ততটুকু জ্ঞান অর্জন করলেই তার পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হবেন। এই জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষকের অপরিহার্য কর্তব্য। শিক্ষকের জ্ঞানে কোনোরূপ ঘাটতি হলে তিনি শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের জ্ঞান বিতরণে ব্যর্থ হবেন। জ্ঞানের ঘাটতির জন্য তিনি ছাত্রদের সঙ্গে জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতারণারও আশ্রয় নিতে পারেন। এই কারণে শিক্ষকের জন্য জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া যে অপরিহার্য তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

শিক্ষকের প্রধান কাজ অর্জিত জ্ঞান শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা। এই জ্ঞান বিতরণের পেছনে যে প্রেরণার দরকার হয় তার উৎস কী? অর্থাৎ মানুষ কোনো কারণে উদ্বুদ্ধ হয়েই বিশেষ কাজে অগ্রসর হয়। যে কারণে সে কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ হয় তা-ই তার প্রেরণা। শিক্ষকতা মহান পেশা হিসেবে উল্লিখিত হয়ে থাকে। কারণ জ্ঞান বিতরণ একটি মহৎ কাজ। এই কাজে শিক্ষকের প্রেরণা ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হয়। শিক্ষক ছাত্রদের ভালোবাসেন বলেই তাদের মঙ্গলের জন্য শ্রেণিকক্ষে জ্ঞান বিতরণ করে থাকেন। শিক্ষকের ভালোবাসা সব ছাত্রের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য। সব ছাত্রের মঙ্গল চিন্তা শিক্ষককে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্জনের দিকে ধাবিত করে। তিনি ছাত্রদের ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও আর্থিক সচ্ছলতা নির্বিশেষে সবাইকে কেবল ছাত্র হিসেবেই দেখেন। শিক্ষক তার এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ছাত্রদের কাছে প্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন। প্রিয় শিক্ষকের কথা ছাত্রদের মনে যতটা ক্রিয়াশীল, শিক্ষক নিরপেক্ষতা হারিয়ে অপ্রিয় হলে ততটা ক্রিয়াশীল হয় না। কারণ বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের ভালোবাসা প্রদর্শিত হলে সাধারণ ছাত্রদের মনে শিক্ষক সম্বন্ধে সন্দেহের জন্ম নেয়। এই সন্দেহ জ্ঞান বিতরণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়।

জ্ঞান বিতরণে সব শিক্ষকের সাফল্য এক রকম নয়। সাফল্যের দিক বিবেচনা করে শিক্ষকদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। সাধারণ শিক্ষক, গড়মান শিক্ষক, ভালো শিক্ষক এবং মহান শিক্ষক। সাধারণ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কেবলই পড়ান। গড়মান শিক্ষক বিষয়ের ব্যাখ্যা করেন। ভালো শিক্ষক ছাত্রদের হাতে কলমে শিক্ষা দেন। আর মহান শিক্ষক কেবলই ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেন।

শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীর আত্মাকে জ্ঞানের অভিমুখী করে দেওয়া যাতে আত্মা নিজে নিজে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিষয়ের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করাই শিক্ষকের কাজ। কোনো বিষয়ের প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি হলে সেই বিষয় জানার জন্য মনের মধ্যে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিষয়টি ভালোভাবে না জানা পর্যন্ত মনের মধ্যে সেই আলোড়ন চলতে থাকে। পড়াশুনার বিষয়বস্তু জানা ও বুঝা

www.pathagar.com

ছাত্রদের কাজ। বিষয়বস্তুর ব্যাপারে ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি হলে বার বার তাগিদ দিয়ে ছাত্রদের মনোযোগ আর্কষণ করার প্রয়োজন হয় না। ছাত্ররা আপন তাগিদেই বিষয়বস্তু জানার ও বুঝার চেষ্টা করে। এর জন্যে বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের মনে কৌতূহল জাগ্রত করা শিক্ষকদের সর্বোত্তম কাজ বলে বিবেচিত। যে শিক্ষক এই কাজটি করেন তিনি মহান শিক্ষক।

আমার স্কুল জীবনে শিক্ষকদের মুখে প্রায়ই ভালো ছাত্রদের প্রশংসা শুনতাম। কিন্তু একজন ছাত্র কীভাবে ভালো ছাত্র হতে পারে বুঝতাম না। আমাদের প্রধান শিক্ষক (স্যার) কে প্রসঙ্গক্রমে বলতে শুনেছিলাম, স্কুলে ভালো ছাত্র আসে না, তাই স্কুল ভালো ফলাফল দেখাতে পারে না। আমি তখন চিন্তা করতাম ভালো ছাত্র আসে কোত্থেকে? এই প্রশ্ন নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতাম না, কেবলই মনে মনে ভাবতাম। আজও পরিণত বয়সে স্কুলটিতে গেলে শিক্ষকদের মধ্যে সেই পুরনো দিনের ভালো ছাত্র পাবার আকাঙ্ক্ষার কথা শুনতে পাই।

অপরদিকে শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনায় ভালো শিক্ষকের প্রশ্ন উঠে আসতে শুনিনি। কিন্তু কেন? শিক্ষক সবাই সমান গুণের অধিকারী হতে পারেন কি? না, সব শিক্ষক একই রকম গুণের অধিকারী নন। গুণীজনদের কাছ থেকে আমরা সাধারণ শিক্ষক, গড়মান শিক্ষক, ভালো শিক্ষক এবং মহান শিক্ষকদের সম্পর্কে ধারণা পাই।

ধরা যাক একজন শিক্ষক ক্লাসে পড়াচ্ছেন– পৃথিবী চেপ্টা নয়, গোলাকার। আবার তা পুরোপুরি গোলকারও নয়, কমলালেবুর মতো উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে চাপা। শিক্ষকের পৃথিবী সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে না। শিক্ষক সরাসরি চলে গেছেন পৃথিবীর আকার বর্ণনায় চূড়ান্ত তথ্য উপস্থাপনে। এতে কম সময়ে তথ্যটি উপস্থাপন করা গেল বটে। কিন্তু ছাত্রদের কাছে তা মুখস্থ করা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে আসবে না। শিক্ষক হয়তো জানেনই না পৃথিবী যে গোলাকার তা নিশ্চিত হতে মানুষকে বছরের পর বছর অনুসন্ধান করতে হয়েছে। হয়তো শিক্ষক অবচেতন মনে ভাববেন, পৃথিবীর আকার সম্বন্ধীয় তথ্যটি কোনো দৈববাণীর অংশবিশেষ। এখানে মানুষের জিজ্ঞাসার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। ইসলাম ধর্মে আমরা কোথাও দেখি না (ধর্মীয় পুস্তকে) মানুষকে ভূগোল বা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য দৈববাণী প্রেরিত হয়েছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে ভূগোল বিজ্ঞানের তথ্য অনুসন্ধান করা মানুষের কাজ। মানুষ গবেষণা করে এগুলোর ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। বাস্তবে পৃথিবী যে গোলাকার তা মানুষের অনুসন্ধানের ফলেই চূড়ান্ত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত শিক্ষকের পদ্ধতির বাইরে অন্য একজন শিক্ষক বলেন, কারো কারো মতে পৃথিবী চেপ্টা এবং কারো কারো মতে পৃথিবী গোলাকার। যারা বলেন, পৃথিবীর গোলাকার তারা এই এই যুক্তি দিয়ে থাকেন। অপরদিকে যারা বলেন,

www.pathagar.com

পৃথিবী চেপ্টা তারা তাদের দাবির সমর্থনে এই যুক্তিগুলো ব্যবহার করেন। তোমরা উভয় দাবির সমর্থনে দেয়া যুক্তিগুলো পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছবে।

আলোচিত শিক্ষকদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় শিক্ষকের ক্ষেত্রে বলা যায় তিনি পৃথিবীর আকার সম্পর্কীয় সর্বপ্রকার তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অবহিত। তাই তিনি ছাত্রদের ইতোমধ্যে অর্জিত জ্ঞানের বিষয়টি মাথায় রেখে যে আলোচনা করেন তাতে বিষয়টির প্রতি ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করবে। কিন্তু প্রথম শিক্ষকের অবলম্বিত পদ্ধতি বিষয়টি সম্পর্কে তার পুরো জ্ঞানের পরিচায়ক নয়। তাই তার আলোচনা ছাত্রদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে ব্যর্থ।

দ্বিতীয় শিক্ষকের আলোচনা ছাত্রদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি করবে। এই কৌতূহল ছাত্রদেরকে বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে দেখতে উদ্বুদ্ধ করবে। এভাবে ছাত্ররা জ্ঞানের যে স্তরে উপনীত হবে সেই স্তরে তাদেরকে ভালো ছাত্র না বলে পারা যাবে না।

কিন্তু এই যে ভালো ছাত্র এরা এল কোত্থেকে? এরা কি জন্মসূত্রেই ভালো ছাত্র ছিল? নাকি অনুকূল পরিবেশে তাদের সুপ্ত প্রতিভা উজ্জীবিত হয়েছে? তারা কি যে কোনো পরিবেশে ভালো ছাত্র হতে পারত? দ্বিতীয় শিক্ষকের পড়ানোর প্রক্রিয়ায় ছাত্ররা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখার অভ্যাস কি গঠন করতে পারে?

ছাত্রদের জ্ঞান অর্জন ও মেধা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষকগণ যা পড়ান ছাত্ররা তা শিখে। শিক্ষক বিষয় ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনায় পুরো বিষয়টি ভেঙে ভেঙে বললে তা ছাত্রদের জন্য সহজ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ছাত্রদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে কোনোরূপ অস্পষ্টতা দেখা দেয় না।

অধ্যয়নযোগ্য বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং কৌতূহল সৃষ্টি করা শিক্ষকের কাজ। এই কাজে শিক্ষককে সফল হতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে তার বিস্তারিত জ্ঞান থাকা দরকার। আংশিক জ্ঞান শিক্ষকের মনে অস্পষ্টতা তৈরি করে। যে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক জ্ঞান দান করেন সে বিষয়ে তার অস্পষ্ট ধারণা তাকে স্পষ্টভাবে কথা বলার সুযোগ দেবে না। অপরদিকে বিষয়ের ওপর শিক্ষকের স্পষ্ট ধারণা ছাত্রদের মনে স্পষ্ট ধারণা জন্মাতে তাকে সুযোগ করে দেবে।

শিক্ষকতার জন্য শিক্ষকের কেবল যথাযথ জ্ঞান থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করলেই হবে না। একজন শিক্ষক দৈনিক কটা ক্লাস নেবেন– তার একটি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত সফল শিক্ষকতার জন্য জরুরি। শিক্ষার ব্যাপারটি অন্যান্য কর্মক্ষেত্র থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে কাজের লিখিত রেকর্ড থাকে না। শিক্ষক দৈনিক কতটুকু কাজ করেন তা অন্যান্য পেশার কাজের মতো বুঝে নেয়া সম্ভব

www.pathagar.com

নয়। শিক্ষকের আন্তরিক ইচ্ছার ওপর তার সেবার মান ও পরিমাণ নির্ভর করে। তাই শিক্ষকের দৈনিক কর্ম ঘণ্টা কত হবে একটি যুক্তিসঙ্গত পন্থায় তা নির্ধারণ করা দরকার। দৈনিক কর্মঘণ্টার পরিমাণ বেশি হলে কাজের মান অনেক নিচে নেমে যেতে পারে। শিক্ষকের কাজের মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে অযথা সময় কাটানোর নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিতে পারেন। সঠিকভাবে দৈনিক কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করে কাজের মান সংরক্ষণ করা জরুরি।

ক্লাসে যাবার আগে শিক্ষকদের একটি প্রস্তুতির ব্যাপার থাকে। প্রস্তুতিপর্বে কত সময় ব্যয় হয় যৌক্তিক পন্থায় তা হিসাব করা দরকার। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষে গলা ফাটিয়ে যে কথাগুলো বলতে হয় তাতে শিক্ষক প্রচুর শক্তি ব্যয় করেন। এই শক্তি ব্যয় করার পর শিক্ষক ক্লান্তি অনুভব করেন। ক্লান্তি দূর করার জন্য শিক্ষকের অবকাশ প্রয়োজন হয়।

এই অবকাশ সময়, শ্রেণিকক্ষে ব্যয়িত সময় ও প্রস্তুতিপর্বের জন্য প্রয়োজনীয় সময় হিসাব করে কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করলে তা যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে।

একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষের বাইরে কিছু কাজ করতে হয়। গুরুত্বের দিক দিয়ে ওই কাজগুলো পঠন পাঠনের মতোই সমগুরুত্ব বহন করে। খাতা দেখা, প্রশ্ন প্রণয়ন করা এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। এই কাজগুলোর জন্য শিক্ষকের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

শিক্ষার স্তরভেদে শিক্ষকদের কাজের প্রকৃতিতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিক স্কুলে ও শিশু স্কুলে শিক্ষকদেরকে শিশুদের মনোগত দিকটি বিবেচনায় নিয়ে কাজ করতে হয়। শিশু মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকদের জ্ঞান না থাকলে শিক্ষকতায় তারা ভালো করতে পারবেন না। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শিক্ষার্থীরা অধিত বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পাশাপাশি কিছু চিন্তা করতে শুরু করে। এ পর্যায়ে শিক্ষকগণ জ্ঞান বিতরণে শিক্ষার্থীদের চিন্তার উপাদানও সরবরাহ করবেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ নবম শ্রেণি হতে শিক্ষার্থীদেরকে বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানে শক্তিমান করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা হলো উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা তাদের উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। শুধু সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না, তাকে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি শক্ত ভিত রচনা করতে হবে।

যে কোনো কাজে জবাবদিহি কাজের গুণগত মান বাড়িয়ে দেয়, অথবা নিদেনপক্ষে কাজের গুণগত মান সংরক্ষণ করে। শিক্ষকদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত হতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের অধীনে শিক্ষকদের সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সভায় প্রতিষ্ঠান প্রধান শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পঠন পাঠনের সাধারণ অগ্রগতি সম্বন্ধে জানার ও বুঝার চেষ্টা করবেন। শ্রেণিকক্ষে পঠন পাঠনের অগ্রগতি সাধিত হলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থা বলা যেতে পারে। এই অবস্থাই প্রত্যাশিত।

www.pathagar.com

কিন্তু এর বাইরে শ্রেণিকক্ষের পঠন পাঠনে অগ্রগতি কম হলে প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে তার কারণ জানতে চাইবেন। শিক্ষকের সন্তোষজনক ব্যাখ্যায় কোনো অসুবিধা উল্লিখিত হলে তা দূর করে দিতে হবে। কারণ শিক্ষায় অগ্রগতির পথে অসুবিধা দূর করেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, মাসিক বা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর এরূপ সভার ব্যবস্থা করে শ্রেণিকক্ষে পঠন পাঠনের অগ্রগতির খোঁজ খবর নিলে একটি সুষ্ঠু জবাবদিহি প্রতিষ্ঠিত হবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অগ্রগতির যে একটি চিত্র উঠে আসবে তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা এবং পাবলিক পরীক্ষায় অর্জিত ফলাফল সঙ্গতিপূর্ণ হলে প্রতিষ্ঠানটি ভালো চলছে বলে নির্দ্বিধায় বলা যাবে। কিন্তু যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরূপ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই সে সব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া ভালো হয়– একথা বলার কোনো ভিত্তি পাওয়া যাবে না।

আমাদের দেশে কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদেরকে তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ক্লাস নেয়ার পর কলেজ কম্পাউন্ড থেকে চলে যেতে দেখা যায়। তারা মনে করেন যে তাদের কাজ কেবল শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছু কাজকর্ম করা। কিন্তু কেবল শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করলেই শিক্ষা প্রাণ পাবে– এরূপ কথা কেউ বলতে পারেন না। ছাত্রদেরকে লাইব্রেরিতে বসে বইয়ের পর বই খুঁজে সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে জানতে হবে। শিক্ষকের পক্ষে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ক্লাসে ছাত্রদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সবটুকু বলে দেয়া সম্ভব হবে না। শিক্ষকের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বক্তব্যে ছাত্ররা একটি সমস্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে শিক্ষকের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী লাইব্রেরিতে বইয়ের পর বই পড়ে সমস্যা সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করবে। লাইব্রেরিতে বই পড়ে ছাত্র লেখকের বা গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে অসমর্থ হলে শিক্ষকের সাহায্য নেবার প্রয়োজন পড়বে। তখন শিক্ষক কলেজ কম্পাউন্ডে অবস্থান করলে ছাত্র তার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয় বুঝার ব্যাপারটি সহজ করে নিতে পারে। শিক্ষক কলেজ কম্পাউন্ডে থেকে নিজেও পড়াশুনা করবেন। তাতে তিনি পুরাতন নোটের ওপর নির্ভরতা কমাতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদেরকে ক্লাসের বাইরেও শিক্ষার্থীদের পরামর্শ (অবশ্যই শিক্ষা সম্পর্কিত) দিতে এবং পড়াশুনায় সাহায্য করতে উৎসাহিত করবেন। যে ছাত্র ক্লাস চলাকালীন শিক্ষকের আলোচনা বা লাইব্রেরিতে বই এর পৃষ্ঠায় গ্রন্থাকারের লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি পড়ে বুঝতে না পারে তাকে শিক্ষক কলেজ কম্পাউন্ডের মধ্যেই বিষয়টি বুঝিয়ে দেবেন। কলেজে এরূপ একটি পরিবেশ গড়ে তোলা সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার জন্য জরুরি।

ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর কৌতূহল সৃষ্টি হলে আপনা থেকেই সে অধ্যয়নযোগ্য বিষয় জানতে ও বুঝতে চাইবে। কিন্তু

www.pathagar.com

কেমন করে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি কৌতূহলী করে তোলা যায় তার জন্য নির্দিষ্ট কোনো ফরমুলা নেই। শিক্ষক তার ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে বিশেষ কৌশলের অবতারণা করে শিক্ষার্থীর মনে কৌতূহল জাগাতে পারেন। তাছাড়া বলা যায় পুরো বিষয় ভেঙে ভেঙে বুঝানোর মাধ্যমে শিক্ষক কৌতূহল সৃষ্টির পথ বের করতে পারেন। কৌতূহল সৃষ্টির ভালো পন্থা হলো শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিবিড় যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

www.pathagar.com

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের পরিচয় কেবল শিক্ষকই। অন্য কিছু না। সমাজ জীবনে তার ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক, বংশীয় এবং এরকম আরো অনেক পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে সবগুলো পরিচয় ছাপিয়ে তিনি কেবল শিক্ষক হিসেবেই থাকবেন। মানুষ রাজনৈতিক সচেতন প্রাণী। অ্যারিস্টটলের মতে রাজনৈতিক চেতনার বাইরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি মানবসত্তার ওপরে বা নিচে বিবেচিত হবেন, কিন্তু মানুষ হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না। নির্বাচনে রাষ্ট্রের সব লোক তাদের পছন্দমাফিক দল বা ব্যক্তির পক্ষে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সব লোকই এক ব্যক্তিকে বা একটি দলকে ভোট দেন না। বরং প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজ পছন্দমতো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ দলকে ভোট দিয়ে থাকেন। এই ভোট দেওয়ার মধ্যে তাদের যে বিবেচনা কাজ করে তাকে রাজনৈতিক চেতনা বলা যেতে পারে। কেউই সেই রাজনৈতিক চেতনা নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাছাড়া ধর্ম এবং নৃতত্ত্বও আমাদের জন্য বিশেষ বিশেষ পরিচয় নিয়ে আসে। ফলে আমরা এসব পরিচয় ছাপিয়ে নিরপেক্ষ হতে পারি না। তাই সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে, একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কীভাবে একজন নিরপেক্ষ শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করবেন।

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন পরিচয়ের জন্য মানুষ কখনো ভাব নিরপেক্ষ হতে পারে না। ধর্ম মানুষের মনে এক ধরনের ভাব জাগ্রত করে, নৃতত্ত্ব করে অন্য ধরনের। সামাজিক মানুষ বিভিন্ন বংশে ও গোত্রে বিভক্ত বলে বংশীয় ও গোত্রীয় প্রভাব তার ওপর থাকবেই। সর্বোপরি সমাজ জীবনে মানুষ তার চিন্তা চেতনায় কম বেশি রাজনীতি ধারণ করে থাকে। তাই ভাব নিরপেক্ষ হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষ আচরণ নিরপেক্ষ হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে এরূপ আচরণ থেকে একজন শিক্ষক নিরপেক্ষ থাকতে পারেন। এই আচরণ নিরপেক্ষতা একজন শিক্ষককে শ্রেণিকক্ষে নিরপেক্ষ শিক্ষক হিসেবে দাঁড়াতে সামর্থ্য যোগায়। শ্রেণিকক্ষের নির্বিশেষ শিক্ষক হিসেবে যিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তিনি সফল

www.pathagar.com

শিক্ষক। নির্বিশেষ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ছাত্রদেরকে নির্বিশেষ ছাত্র হিসেবে দেখেন। তার ছাত্র হিন্দু নাকি মুসলিম, ধনী নাকি গরিব, উচ্চ বংশীয় নাকি নিম্ন বংশের তা তিনি দেখতে চান না। তিনি কেবলই জানেন উপস্থিত সবাই তার ছাত্র। শ্রেণিকক্ষে অবস্থানের সময় তার মনোজগতে দুটো বিষয়ের অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেন– ছাত্র ও ছাত্রের পাঠ্য বিষয়। তার সামনে উপস্থিত ছাত্ররা জ্ঞান অর্জনের ধারাবাহিকতায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে তা মাথায় রেখে কীভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপন করলে সহজে বিষয়টি ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য হবে তাই তিনি ভেবে দেখেন। উপস্থিত সব ছাত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়ে জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করেন। শিক্ষকের এরূপ আচরণ প্রত্যেক ছাত্রের মানসপটে একজন আদর্শ শিক্ষকের প্রতিচ্ছবির জন্ম দেবে। ছাত্ররা তাদের সামনে প্রিয় শিক্ষকের উপস্থিতি অনুভব করবে। এই শিক্ষক যা বলবেন ছাত্ররা সশ্রদ্ধচিত্তে তা গ্রহণ করবে।

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের বাইরে কোনো শিক্ষক আচরণে নিজেকে মুসলিম, হিন্দু বা বিশেষ নৃ-গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলে শীঘ্রই ছাত্রদের আস্থা হরিয়ে ফেলবেন। ফলে তার পক্ষে সহজে জ্ঞান বিতরণ করা সম্ভব হবে না। তিনি মুসলিম হলে অমুসলিম ছাত্ররা তাকে মুসলিম ছাত্রদের প্রতি দরদি ও অমুসলিম ছাত্রদের প্রতি বিরাগভাজন বলে মনে করবে। অনুরূপভাবে বাঙালি শিক্ষক অবাঙালি ছাত্রদের আস্থা হারাবেন। তার বক্তব্য অবাঙালি ছাত্রদের মনে অনুকূল প্রভাব ফেলতে পারবে না।

জ্ঞান বিতরণ ভালো কাজ। প্রত্যেক ভালো কাজের পেছনে দুটো জিনিস ক্রিয়াশীল। একটি ভালোবাসা ও অপরটি জ্ঞান। ভালো কাজের উৎস হিসেবে তার পেছনে ভালোবাসা থাকবে। পরে কাজটি জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হবে। শিক্ষকের অপরিহার্য জ্ঞান সম্পর্কে পূর্বতন পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে পুনরায় জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ নেই। প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ভালোবাসা ভালো কাজের প্রথম শর্তটিই পূরণ করে। শিক্ষকের ভালোবাসায় ছাত্র ভেদে পার্থক্য না হলে ভালো কাজের প্রথম শর্তটিই পূরণ হয়। তা না হলে বিশেষ ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ভালোবাসা ও অন্যান্য ছাত্রের প্রতি তার বিরাগ মনোভাব ভালোবাসার প্রকৃত চেতনা থেকে শিক্ষককে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। পরিণামে প্রকৃত ভালোবাসার অবাবে জ্ঞান বিতরণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ছাত্র শিক্ষককে ভয় করবে এরূপ মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষার সহায়ক বলে মনে হতে পারে। সাধারণভাবে আমরা বুঝি ছাত্র শিক্ষককে ভয় পেলে শিক্ষকের আদেশ নিষেধ ছাত্র মেনে চলবে। কিন্তু বাস্তবে ছাত্রের মনে ভয় তার পঠনপাঠনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তখন শিক্ষকের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও বুঝার চেষ্টা করা ছাত্রের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ আলোচনা

www.pathagar.com

সঠিকভাবে শোনা ও বুঝার জন্যে ছাত্রের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক হওয়া দরকার। ভয় ছাত্রের স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার ক্ষতি করে। ফলে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

ভয় পেলে ,মানুষের মাথা সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। ছাত্রদের ব্যাপারে ব্যাপারটি আরো বেশি সত্য। পড়াশুনার ব্যাপারে দুটো বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন। পাঠ্য বিষয় ছাত্রদেরকে বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে। এই উভয় ব্যাপারে সফল হতে হলে ছাত্রকে মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু মানসিক দিক দিয়ে ছাত্রের যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা প্রয়োজন তাতে কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটলে পঠিত বিষয় মনে রাখা এবং বুঝা দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর জন্য শিক্ষককে ছাত্রদের সঙ্গে ব্যবহারে সতর্ক হতে হবে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বেত মারার প্রচলন থাকা অবস্থায় ছাত্ররা শিক্ষকদের ভয় করত। কোনো কোনো শিক্ষককে ছাত্ররা যমের মতো ভয় করত। এই যে ছাত্রদের মনে শিক্ষকের ভয় তা খুবই ক্ষতিকর। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কচি মনে একবার ভয় ঢুকলে তা সারাজীবনের জন্য তাদের মানসিকভাবে দুর্বল করে দিত। বেত মারার বাইরে আরেকটি ভয়ও ছাত্রদের ক্ষতি করে থাকে। ছাত্র জীবনের যে সব পর্যায়ে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেখানে শিক্ষক ছাত্রদের ফেল করানোর ভয় দেখাতে পারেন। অভিজ্ঞতা আমাদের বলে দেয় যে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের উপস্থিতিতে ছাত্র সঠিকভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মানসিক ভয় উৎপাদনের কারণ দূর করতে হবে। যারা আগামী দিনে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দেবে তাদেরকে সর্বতোভাবে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা থাকবে। শ্রদ্ধা অর্জনের বিষয়। এই শ্রদ্ধা অর্জনের জন্য শিক্ষককে দুটো গুণের অধিকারী হতে হবে। প্রথমত শিক্ষক প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। জ্ঞানের ঘাটতি হলে শিক্ষক ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জনে ব্যর্থ হবেন। দ্বিতীয়ত শিক্ষককে আচরণে নিরপেক্ষ হতে হবে। জাতি ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে সব ছাত্রকে সমানভাবে ভালোবাসা এবং জ্ঞান বিতরণে ছাত্রভেদে পার্থক্য না করাই আচরণে নিরপেক্ষ হওয়ার লক্ষণ। এই দুটো গুণের অধিকারী শিক্ষক ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন হবেন– সন্দেহ নেই। শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের উপদেশ ও পরামর্শ ছাত্রদের মানস জগতে শিক্ষার অনুকূল সাড়া জাগাতে সক্ষম।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই এক অমূল্য সম্পদ। বই ছাত্রদের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ হলে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি হবে শিক্ষকমণ্ডলীর প্রাণ। শিক্ষালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের জ্ঞান চর্চার প্রধান অবলম্বন বই।

www.pathagar.com

মননশীল লেখকদের লেখা বই ছাত্রদের পড়তে দেয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ছাত্ররা যাতে লাইব্রেরিতে বসে বিভিন্ন বই পড়তে পারে তার ব্যবস্থা থাকা জরুরি। ক্লাসে শিক্ষকের বক্তব্য ছাত্রদেরকে একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে (বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে)। ছাত্ররা সেই নির্দেশনা পেয়ে জ্ঞান অর্জনের দিকে ধাবিত হবে। তারা লাইব্রেরিতে যাবে এবং বইয়ের পর বই পড়ে জ্ঞান লাভ করবে। একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন লেখকের বইয়ে থাকে বিভিন্ন চিন্তা ও বিভিন্ন ধরনের উপস্থাপনা। ছাত্ররা বইয়ের পরে বই পড়তে পড়তে বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিষ্কার করবে। তাছাড়া বিভিন্ন মননশীল লেখকের বই পড়ে শিক্ষার্থীর মনেও নতুন চিন্তা জাগ্রত হবে। কারণ একটি চিন্তা আরেকটি চিন্তার জনক হতে পারে। এক বই হতে পারে আরকটি বইয়ের জননী। তাই বিভিন্ন বই বেশি বেশি পড়ার মধ্যে রয়েছে জ্ঞান অর্জনের আসল শক্তি। কিন্তু বই পড়তে হবে সচেতনভাবে। চিন্তা ব্যতীত বই পড়া, বই পড়া নয়। কারো কারো মতে চিন্তা ছাড়া বই পড়া বই না পড়ার চেয়েও ক্ষতিকর। যারা বই লেখেন তাদের লেখার পরিমাণের চেয়ে বই পড়ার পরিমাণ কম হলে স্যামুয়েল জনসন তাদের সাথে কথা বলতে রাজি হননি।

কিন্তু বই এমন বিষয় যা ভেতর থেকে আগ্রহ সৃষ্টি না হলে পড়া যায় না। জোর করে বই পড়া কষ্টকর ব্যাপার। বই পড়তে হয় আনন্দের জন্য। বই পড়ে আনন্দ না পেলে পঠিত বিষয় মনের মধ্যে স্থায়ী হয় না। কিন্তু বই পড়ে আনন্দ পেতে হলে বইয়ের বিষয়গুলোর সঙ্গে ছাত্রের ইতোমধ্যে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। আবার এই সঙ্গতি লাভের জন্য প্রয়োজন ছাত্রের পড়াশুনায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। পড়াশুনার কোনো পর্যায়ে ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে তা পরবর্তী পর্যায়ের পড়াশুনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। যেখানে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় সেখানে ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হলে শিক্ষা থেকে ছাত্রের ঝরে পড়ার ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে তা ছাত্রকে নতুন করে সামনে অগ্রসর হওয়ার শক্তি জোগায়।

পড়াশুনার ক্ষেত্রে জ্ঞান অর্জনের ধারাবাহিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য সদ্যপ্রয়াত জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের জীবন থেকে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে বলে মনে হয়। হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকার নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে গেছেন। ডানবার হলের তেত্রিশ নম্বর কক্ষে ক্লাস শুরু হয়েছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ক্লাস। ক্লাসে ছাত্র সর্বমোট পনেরো জন। শিক্ষক মার্ক গর্ডন। মার্ক গর্ডন প্রথম দিনের ক্লাসে সহজ বিষয়গুলো নিয়েই কথা বলছিলেন। লেকচারে গ্রুপ থিয়োরি ব্যবহার করায় হুমায়ূন আহমেদ কিছুই বুঝতে

www.pathagar.com

পারেননি। পাশে বসা এক আমেরিকান ছাত্রকে লেকচার বুঝেছে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, "এগুলো খুবই এলিমেন্টারি ব্যাপার।"

হুমায়ূন আহমেদ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের প্রচুর বই সংগ্রহ করেন। কিন্তু ক্যালকুলাসের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকায় রাতদিন পড়াশুনা করেও কোনো অগ্রগতি লাভ করতে পারেননি। তিনি মিডটাম পরীক্ষার খাতা কিছু না লিখেই জমা দেন। এতে নিজের মেধা সম্পর্কে তার আস্থা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হুমায়ূন আহমেদ হাল ছাড়েননি। তিনি আপন প্রচেষ্টায় অংক শিখলেন, শিখলেন অপারেটর এলজাবরা ও গ্রুপ থিয়োরি। এক সময় লক্ষ করলেন, তিনি একটু একটু কোয়ান্টাম মেকানিক্স বুঝতে শুরু করেছেন। তারপর তিনি ক্রমেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে উৎসাহী হচ্ছিলেন। এই উৎসাহ বৃদ্ধি পেলে ক্রমেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে তার ধারণা পরিষ্কার হতে থাকে। অবশেষে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে তিনি কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। হুমায়ূন আহমদ তার আত্মজীবনীমূলক "আপনারে আমি খুঁজিয়া বেড়াই" পুস্তকে বলেন, "পাঠকের কাছে আমার ফাইনাল পরীক্ষার অর্জন বর্ণনা করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ফাইনাল পরীক্ষায় আমি পেয়েছিলাম ১০০ তে ১০০।"

একটি পরীক্ষা দিয়েই হুমায়ূন আহমেদ ইউনিভারসিটিতে পরিচিত হয়ে যান। যিনি মিডটার্ম পরীক্ষায় কিছুই লিখতে পারেননি তিনি ফাইনাল পরীক্ষায় পেলেন ১০০ তে ১০০। মিডটার্ম পরীক্ষার আগে কোয়ান্টাম মেকনিক্সে তার কোনো ব্যকগ্রাউন্ড ছিল না। ফাইনাল পরীক্ষার আগে অংক, গ্রুপ থিয়োরি ও অপারেটর এলজাবরা শিখে তিনি প্রয়োজনীয় জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করেন। এই শূন্যতা পূরণ জ্ঞানার্জনে বিঘ্নিত ধারাবাহিকতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ব্যাকগ্রাইন্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। জ্ঞানার্জনে ধারাবাহিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একে অবহেলা করে ছাত্রদের সামনে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। জ্ঞান অর্জনে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠ্য বিষয়ের আলোচনায় আন্তরিক হবেন। শিক্ষকের আলোচনায় বিষয়টি ছাত্রদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপিত হবে যেন ছাত্ররা সহজে বিষয়টি বুঝতে পারে। যে বিষয় ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে সেই বিষয়েই ছাত্ররা আনন্দ পায় এবং বুঝে নিতে ও শিখে নিতে উৎসাহ বোধ করে। পক্ষান্তরে শিক্ষকের উপস্থাপনায় বিষয়টি দুর্বোধ্য হলে ছাত্রদের মনে বিষয়টি সম্বন্ধে একটি ভীতি জন্ম নেয়। মানুষ যা ভয় করে তা গ্রহণ করতে পারে না। পরিণামে তা থেকে দূরে থাকতে চায়। অনুরূপভাবে ছাত্রদের কাছে পাঠ্য বিষয় দুর্বোধ্য মনে হলে তা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে ছাত্ররা বিষয়টি এড়িয়ে চলে। এই যে পাঠ্য বিষয় এড়িয়ে চলা তা ছাত্রদের অভ্যাসে পরিণত হলে জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের পত্র পত্রিকায় শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংবাদে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে ঝরে পড়ার বিষয়টি দেখতে পাই। এই ঝরে পড়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সবগুলো কারণের মধ্যে জ্ঞানার্জনের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া সবচেয়ে মারাত্মক কারণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আমাদের নদীমাতৃক বাংলাদেশে কিশোর তরুণদেরকে নদীতে সাঁতরাতে দেখা যায়। সাঁতার কেটে নদী পার হওয়া তরুণদের একটি আনন্দজনক বিষয়। যে তরুণের পক্ষে সাঁতার কাটা সহজ ব্যাপার সে সাঁতরে নদী পার হতে ভয় পায় না। কিন্তু সাঁতার কাটা কারো কাছে কঠিন হলে সে সাঁতরে নদী পার হতে পারে না। অনুরূপভাবে পড়াশুনার ব্যাপারটি ছাত্রদের নিকট কঠিন হয়ে দাঁড়ালে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে উচ্চ শিক্ষা নেয়া কঠিন ব্যাপারে পরিণত হয়। কিন্তু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবিষয় সহজবোধ্য করে দিলে ছাত্ররা জ্ঞানার্জনে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবে। পরিণামে তারা ভালো ছাত্রে পরিণত হবে। ভালো সাঁতারু তরুণ যেভাবে সাঁতরে নদী পার হতে পারে তেমনি ভালো ছাত্রও শিক্ষার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভে সক্ষম হবে।

আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির এক বিরাট প্রভাব লক্ষ করা যায়। ছাত্র রাজনীতিতে দলীয় রাজনীতির লেজুর বৃত্তি একে শোচনীয় অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ছাত্ররা ক্ষমতাসীন দলের অনুসারী হলে এক ধরনের ক্ষমতা প্রদর্শন করে। এই ক্ষমতা শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট করে। শিক্ষকদের কাছে সরকারের লেজুর দলের ছাত্র এবং ছাত্রনেতাদের মূল্য সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় অনেক বেশি হোক এটা তারা চায়। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। আমি একবার কোনো এক উপজেলা সদরে অবস্থিত একটি সরকারি কলেজে বদলি হই। সে কলেজে আমার চাকরি বেশি দিন হয়নি। ছাত্রদের প্রায় সবাই আমার কাছে অপরিচিত। এমতাবস্থায় একদিন এক ছাত্র আমার কাছে একটি ফটো সত্যায়িত করাতে আসে। ফটোটি ছিল অন্য কোনো ছাত্রের। ফটো সত্যায়িত করার অর্থ আমার জানা ছিল। আমি তার কাছে অপরিচিত কারোর ফটো সত্যায়িত করতে আমার অক্ষমতা প্রকাশ করি। ছেলেটি ছিল একটি প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। তাই সে বলল, "স্যার বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেননি। আমি অমুক ছাত্রসংগঠনের সাধারণ সম্পাদক।" তার পরিচয় প্রকাশ করার পরও আমি তার ফটো সত্যায়িত করে দেইনি। তাই সে রেগেমেগে অস্থির হয়ে উঠেছিল। ওই কলেজের পুরনো একজন প্রভাষক ফটোটি সত্যায়িত করে দিলে ছেলেটির ক্রোধ প্রশমিত হয় ও চলে যায়। পরে প্রভাষকের সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারলাম যে ফটো সত্যায়িত করে দেয়ার পুরো তাৎপর্য সম্পর্কে তিনি অবহিত নন।

www.pathagar.com

শুধু ছাত্ররাই যে রাজনীতি করে তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ছাত্র রাজনীতির জন্য ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনুরূপভাবে শিক্ষক-রাজনীতিও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে ক্ষতি করছে। শিক্ষক রাজনীতিতে যারা জড়িত তাদের এক একজন এক একটি দলের সদস্যপদ লাভ করেন। তা প্রকাশিত হবার পর তাদের পক্ষে শ্রেণিকক্ষে নির্বিশেষ শিক্ষক হিসেবে দাঁড়ানোর সুযোগ হারিয়ে যায়।

আজকাল স্কুল কলেজে প্রাইভেট পড়া ছাত্রদের মধ্যে একটি সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমি শিক্ষক হিসেবে চাকরিরত থাকা অবস্থায় দেখেছি কলেজগুলোর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়ার পর পরই ছাত্ররা প্রত্যেক বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রাইভেট পড়া শুরু করে। ছাত্ররা সকালে নাস্তা করেই টিউটরদের বাসায় হাজির হয়। একজন বা দুইজন শিক্ষকের কোচিং নিয়ে তারা কলেজের নিয়মিত ক্লাসে হাজির হয়। কলেজের নিয়মিত ক্লাস শেষ হলে আবার বিকালে প্রাইভেট পড়ে রাতে বাড়ি ফেরে। এটা উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে অনেকেরই সাধারণ রুটিন কাজ। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রাইভেট পড়া সীমিত অর্থে প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু ব্যাপকভাবে কেন প্রাইভেট পড়া প্রয়োজন হলো– বলা মুশকিল। যে সব শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান তারা একটি বা দুইট ব্যাচ পড়ান না। রুটিন করে সকাল বিকাল অনেকগুলো ব্যাচ পড়ান। এই ব্যাচগুলো পড়িয়ে যখন তারা কলেজের নিয়মিত ক্লাসে হাজির হন তখন ক্লান্তি তাদেরকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে কাজ করতে দেয় না। চাকরির খাতিরে ক্লাসে গেলেও কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে কর্তব্য পালন করেন বলা মুশকিল। এ তো গেল শিক্ষকদের কথা। অপরদিকে ছাত্ররাও প্রাইভেট পড়ার পর ক্লান্ত হয়ে নিয়মিত ক্লাসে যায়। এই ক্লান্তি তাদেরকে ক্লাসে শিক্ষকের প্রতি মনোযোগী হতে দেয় না। তাছাড়া শিক্ষকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার প্রয়োজনও তাদের নেই। কারণ ইতোমধ্যে তারা ক্লাসের পাঠ্য বিষয় প্রাইভেট কোচিং এ পড়ে ফেলেছে। এই প্রাইভেট পড়ুয়া ছাত্রদের উপস্থিতি নিয়মিত ক্লাসের পরিবেশ নষ্ট করে। শিক্ষকদের সামনে অমনোযোগী ছাত্রদের উপস্থিতি তাদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। ফলে শিক্ষক সুষ্ঠুভাবে জ্ঞান বিতরণের কাজ করতে পারেন না।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে প্রাইভেট কোচিং আমাদের দেশের ছাত্র সমাজে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাইভেট কোচিং এর প্রাইভেট শব্দটির মধ্যে একটি "একান্ত" ভাব রয়েছে। এই একান্ত ভাবটি অতি কম সংখ্যক ছাত্রদের নিয়ে কোচিং ক্লাস অনুষ্ঠিত হলে সংরক্ষণ করা যেত। কিছু ছাত্রসংখ্যা বেশি হলে এই একান্ত ভাব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আমার পরিচিত একজন লোক পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে স্কুলের ছাত্র ছিলেন। তিনি স্কুলে পড়লেও

www.pathagar.com

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা না দিয়েই পড়াশুনায় ইতি টানেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অনেকের মতো তিনিও চাকরি নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমান। দীর্ঘদিন তিনি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করেন। তারপর একসময় স্থায়ীভাবে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফেরার পর প্রাইভেট পড়ার হালচাল দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি স্কুল জীবনে স্কুলের উপরের ক্লাসগুলোতে ১৫/১৬ জন ছাত্র দেখেছেন। ক্লাসের এরূপ একটি চিত্র যখন তার মনের পর্দায় ভাসছিল তখন তিনি এক একজন টিউটরকে ২০ এর অধিক ছাত্রকে একসঙ্গে কোচিং দিতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান। তিনি বলেন, "প্রাইভেট কোচিং এ একটি ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা আমাদের সময়ের নিয়মিত ক্লাসের ছাত্র সংখ্যার চেয়ে বেশি। তাই এগুলোকে কীভাবে প্রাইভেট কোচিং বলা যায়?" এখানে টিউটররা প্রাইভেট শব্দটির অপব্যবহার করছেন। শিক্ষক নিয়মিত ক্লাসে পাঠ্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে শিক্ষার্থীরা বিষয় সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভে সক্ষম হয়। কিন্তু প্রাইভেট কোচিং এ টিউটর পরীক্ষায় পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোই বিবেচনায় রাখেন। ফলে পাঠ্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা না করে কেবল নির্বাচিত (গুরুত্বপূর্ণ) অংশগুলোই আলোচনা করেন। এর ফলে শুধু ছক বাধা বিষয়ে শিক্ষা অর্জনের দিকে ঝোঁক সৃষ্টি হয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের সীমানা বৃদ্ধি করা এবং মেধা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে দেওয়া। এই যে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য তার দিকে আমাদের নজর দেওয়া জরুরি। এগুলো নস্যাৎ করে দিলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে বেড়ে ওঠা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ যন্ত্রের স্পেয়ার পার্টসে পরিণত হবে। পরিণামে আগামী দিনগুলোতে আমাদের দেশ ও জাতি বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।

শিক্ষকমণ্ডলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। শিক্ষার পরিবেশ শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে কী শিখতে পেল তা একটি মাপকাঠিতে ফেলে পরিমাপ করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এরজন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে, পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের সঠিক চিত্র স্পষ্ট করে তোলার দিকে প্রশ্নকর্তার মনোযোগ দেওয়া উচিত। এরূপ করা হলে কোচিং এ বা নিয়মিত ক্লাসে কোথাও শিক্ষকগণ কেবল পাঠ্য বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে মনোযোগ দিতেন না। তারা পাঠ্য বিষয়ের পূর্ণ রূপটিই শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরে তাদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করতেন।

কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উল্লাস করতে দেখা যায়। আশাতীত ফলাফল অর্জিত হলেই উল্লাসে ফেটে পড়ার কথা। আমরা টেলিভিশনে অনেককেই ফলাফলের ওপর আলোচনায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশংসা করতে দেখি। প্রশংসা করা একটি ভালো বিষয়। প্রশংসায় ছাত্র-ছাত্রী উৎসাহবোধ করে। পরিণামে তারা লেখাপড়ায়

www.pathagar.com

মনোযোগী হয়। কিন্তু অতি প্রশংসা ভালো কিনা ভেবে দেখার বিষয়। আমি বলছি না টেলিভিশনে ছাত্র-ছাত্রীদের যে প্রশংসা করা হয় তা অতি প্রশংসা। তবে আমি বলতে চাই ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের প্রশংসা করার সময় তাদের কিছু কিছু ত্রুটির দিকও তুলে ধরা দরকার। একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। একটি টেলিভিশন আলোচনায় একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষককে (ইংরেজি বিভাগের প্রফেসর) সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে দেখা যায়। তিনি প্রশ্নের জবাবে ঢালাওভাবে শিক্ষার্থীরদের অর্জনকে প্রশংসা করেছেন বলে মনে হয়নি। তার মতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থী ইংরেজিতে A+ পেয়ে ইংরেজি অনার্স কোর্সে ভর্তি হয় তাদের অর্জিত ইংরেজি জ্ঞান প্রদর্শিত ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কারো মনে হতে পারে প্রাইভেট কোচিং এর ঘোর বিরোধী হলে যে কোনো লোকের পক্ষে এরূপ আলোচনা করা সম্ভব। কিন্তু আমি সীমিত অর্থে প্রাইভেট পড়ার সমর্থনেও যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। একটি ক্লাসে অনেক ছাত্র-ছাত্রী থাকে। তাদের সবার মেধা এক নয়। আবার একটি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনুসরণীয় কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকগ্রাইন্ডও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও ব্যাকগ্রাউন্ডে তারতম্য থাকার ফলে সবাই ক্লাসে সমভাবে শিক্ষকের আলোচনা হজম করতে পারে না। কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী মেধা ও ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকার জন্য ক্লাসের আলোচনায় শিক্ষক যে গতিতে এগিয়ে যান সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারে না। তাই ক্লাসের পড়াশুনায় সক্ষমতার দিক দিয়ে যারা যেটুকু ঘাটতির সম্মুখীন হয় তা পূরণ করার জন্য তারা প্রাইভেট পড়তেই পারে। উন্নত বিশ্বেও এরূপ প্রাইভেট পড়ার প্রচলন রয়েছে।

কিন্তু কোনোভাবেই ব্যাপক প্রাইভেট পড়া সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে চিন্তা শক্তিতে বলীয়ান করে দেওয়া। এই অর্থে শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে সক্ষম হবে। ব্যাপক প্রাইভেট কোচিং ব্যবস্থায় যে সব শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জন করেছে তারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারলেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জনে ব্যর্থ হবে। শিক্ষা জীবন শেষে মানুষ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে সে নিত্য নতুন সমস্যার সম্মুখীন হবে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো পূর্ব প্রস্তুত ফরমুলা থাকে না। যিনি যে সমস্যার মুখোমুখি হবেন তাকে সেই সমস্যা সমাধানের ফরমুলা নিজ মেধা ও জ্ঞান ব্যবহার করে তৈরি করতে হবে। শিক্ষা জীবনে যিনি স্বকীয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি নানাবিধ সমস্যা সমাধানের সফল পন্থা বের করতে পারবেন না।

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা

আলংকারিক শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উভয় প্রকার শিক্ষাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অপরিহার্য। এই অধ্যায়ে শিক্ষার স্তর ভিত্তিক আলোচনা করা হবে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা জীবনকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা। নবপ্রণীত শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা; নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চার বছর মেয়াদি মাধ্যমিক শিক্ষা; কৃষি, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিংসহ সাধারণ শিক্ষায় অনার্স, মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্তাশক্তি জাগ্রত করা।

শিশুদের বর্ণমালা শিক্ষার বইয়ে দেখা যায় প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে কোনো প্রাণি, বা উদ্ভিদ বা কোনো বস্তুর ছবি আংকন করে দেয়া হয়েছে। এগুলোর উদ্দেশ্য শিশু মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা। শিশুকে বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছবির সাহায্যে প্রাণি, উদ্ভিদ বা বস্তুর নাম শিখানো হয়। পরে বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে, গঠিত শব্দ ও শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাক্যের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করা হয়। শব্দের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ভাষা শিক্ষার ভিত রচনা করে। পরে বিভিন্ন শব্দের সমন্বয়ে বাক্য গঠনে সক্ষম হলে শিশু তার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারে।

এখানে দেখা যায় শিশু মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রথমে বর্ণ পরিচয় ও বর্ণের সঙ্গে অঙ্কিত প্রাণি, উদ্ভিদ বা কোনো বস্তুর ছবির সাহায্যে শব্দ পরিচয় পরবর্তী স্তরে বাক্য রচনায় শিশুকে সামর্থ্য যোগায়। শিশুর বর্ণ পরিচয় ও বর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দের সঙ্গে পরিচয়ে রয়েছে বিশ্বাস সৃষ্টির ব্যাপার। শিশু মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিশুকে যোগ্য করে তোলা হয়।

প্রাথমিক কিছু বিষয়ের ওপর বিশ্বাস সৃষ্টি হলে শিশু ওই বিষয়গুলোর সাহায্যে জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এই পর্যায়ে শিশু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করে থাকে যা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস নির্ভর। চতুর্থ-পঞ্চম

www.pathagar.com

শ্রেণিতে উন্নীত হলে শিশুর মধ্যে কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়। তাই এই পর্যায়ে শিশুকে ভালো গল্পকারের গল্প পড়ার ব্যবস্থা করে দেয়া উচিত। গল্প পড়লে শিশু একদিকে কল্পনা শক্তি অর্জন করবে এবং অপরদিকে ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত করার সুযোগ পাবে। এই স্তরে বিজ্ঞান বিষয়ে বেশি জ্ঞান দান করার প্রয়োজন নেই। কারণ বিজ্ঞানের জ্ঞান শিশুর কল্পনা শক্তির বৃদ্ধি রহিত করে দেয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেল টেক্সি চালিয়ে যাবার সময় লক্ষ করেন চলন্ত টেক্সির অগ্রভাগে ছোপ ছোপ ছায়া আবির্ভূত হয় এবং টেক্সি চলার সাথে ছায়াও টেক্সির বডির উপর দিয়ে চলতে চলতে এক সময় বডির বাইরে চলে যায়। বিষয়টি রাসেলকে আনন্দ দেয়। এক সময় রাসেল আবিষ্কার করেন যে গাড়ির বডির উপর ছোপ ছোপ ছায়া গাছের পাতার ছায়া ভিন্ন কিছু নয়। এই আবিষ্কারের পর গাড়ির বডির উপর চলন্ত ছায়া থেকে রাসেলের প্রাপ্ত আনন্দ রহিত হয়ে যায়। তখন তিনি চিন্তা করতে থাকেন ছোট ছোট ছিদ্রপথে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করে যে আলোকিত ছোপ সৃষ্টি করে তা গোলাকার হয় কেন? এভাবে রাসেল বুঝতে পারেন মাথায় বিজ্ঞানের চিন্তাভাবনা ঢুকে গেলে কল্পনার ট্রেন মাথা থেকে দূর হয়ে যায়। তাই শিশু বয়সে মানুষের মধ্যে কল্পনা শক্তি সৃষ্টির জন্য শিশুর বিজ্ঞান চর্চা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন।

শিশু ক্রমান্বয়ে জ্ঞানের জগতে ঢুকতে থাকলে এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে উপরের শ্রেণিতে প্রমোশন পেলে তার মধ্যে চিন্তার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। তখন সে কেবল বিশ্বাসভিত্তিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। তার চিন্তাশক্তি তাকে নতুন বিষয় যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে উৎসাহ জোগায়। সে আস্তে আস্তে বিশ্বাসের জগৎ থেকে যুক্তির জগতে প্রবেশ করে। কিন্তু এই যুক্তির জগতে প্রবেশের অর্থ এই নয় যে সে আগের বিশ্বাসের বিষয়গুলো অস্বীকার করে। বরং এর অর্থ আগের বিশ্বাসগুলোকে ভিত্তি হিসেবে ধরে এগুলোকে যুক্তির রাজ্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে। বলা প্রয়োজন যে ছাত্রজীবনের যে সময়ে শিক্ষার্থী বিশ্বাসের জগৎ থেকে যুক্তি জগতে প্রবেশ করে সেই সময়টি হচ্ছে তার উত্তরণকাল। এই উত্তরণকালে শিক্ষার্থী কয়েক বছর কাটায়। এ পর্যায়ে সে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনে অভ্যস্ত হয়। শিক্ষা জীবনের এই পর্যায়টি হলো মধ্যমিক শিক্ষা।

কারো কারো মতে বিশ্বাস হলো যুক্তির অভাব। কথাটির মধ্যে সত্যের উপাদান রয়েছে বটে। কিন্তু তা পুরোপুরি সত্য মনে করে বিশ্বাসকে বিদেয় করে দিলে চলবে না। বিশ্বাস জ্ঞানের অপরিহার্য উপাদান। অন্য কথায় বিশ্বাস হলো জ্ঞানের ভিত্তি। কারণ মানুষ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সৃষ্টির আদি, অন্ত ও রূপান্তর সম্পর্কে সে পুরোপুরি জ্ঞানলাভে অক্ষম। তাই অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে কোনো কোনো বিষয়ে কখনো কখনো কিছু কিছু বিশ্বাসের ওপর

www.pathagar.com

নির্ভর করতে হয়। অনেককেই বলতে শোনা যায়– যা দেখি না তা বিশ্বাস করতে পারি না। আমি বলি, আমি যা দেখি তাতে আমার বিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। আমি যা দেখি না সে ব্যাপারে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু সব বিশ্বাসই অন্ধবিশ্বাস নয়। যে বিশ্বাসের পিছনে যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান তা যৌক্তিক বিশ্বাস বা বিশ্বাস। অন্ধ অনুকরণ অন্ধবিশ্বাস। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বা সমাজবিজ্ঞানে আমরা অনেক মডেল কল্পনা করে বিষয় ভিত্তিক গবেষণা করি। মডেল ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেলেই আমরা ওই কাল্পনিক মডেলকে নির্ভরযোগ্য মডেল হিসেবে গ্রহণ করি। মডেল ভিত্তিক বিশ্লেষণ আমাদেরকে অবাস্তব ফলাফল প্রদান করলে তা ছুড়ে ফেলে দিই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান থেকে এর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। গ্যাসের চাপ, আয়তন ও তাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কতগুলো মৌলিক ধারণার ওপর বৈজ্ঞানিকদের নির্ভরশীলতা দেখতে পাই। বৈজ্ঞানিকগণ ধারণা পোষণ করেন যে, গ্যাস অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। কণাগুলো গোলাকার। এগুলো সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। গ্যাসের কণাগুলো এলোমেলোভাবে ছুটাছুটির সময় একটি আরেকটির গায়ে ধাক্কা দেয় এবং পর পর কতগুলো ধাক্কার পর শেষ পর্যায়ে পাত্রের গায়ে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলেই পাত্রের গায়ে গ্যাসের চাপ সৃষ্টি হয়। মূলত এই ধারণাগুলো ও এর সঙ্গে আরো কিছু রাশি মিলিয়ে পদার্থবিদগণ গণনার মাধ্যমে গ্যাসের চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রার মধ্যে যে সম্পর্ক দেখতে পেয়েছেন তা বাস্তবতার সাথে মিলে যায়।

বিশ্বাস জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। নিউটন বলেছেন, যে কোনো দুটি বস্তুকণা যে কোনো দূরত্বে থেকে একে অপরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলই মহাকর্ষ বল নামে খ্যাত। কেউ কখনো দেখতে পায়নি এই আকর্ষণ বল। অথচ আমরা তাতে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস আমাদের আছে বলে অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাবলি আমরা এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি।

বিশ্বাস ও যুক্তি পরস্পর অন্বয় ও সম্পর্কযুক্ত। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশ্বাসে উপনীত না হলে যুক্তি কোনো কাজেই আসে না। বিশ্বাস যুক্তির ভিত্তিস্বরূপ। কোনো বিষয়ের প্রথমে প্রয়োজন বিশ্বাস। পরে যুক্তির অবতারণা।

শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাজীবনের সূচনা হয় শিশুদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে তারপর বিশ্বাসের উপাদানের ওপর ভিত্তি করে যুক্তি ব্যবহার শুরু হয়। আগেই বলা হয়েছে শিক্ষাজীবনের একপর্যায়ে বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে একটি সমন্বয়ের অভ্যাস শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তোলা প্রয়োজন। যে পর্যায়ে এসে এই সমন্বয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তা হলো মাধ্যমিক শিক্ষা। শিক্ষার জন্য পুরো শিক্ষা জীবনই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার এই কালটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে ছাত্রের গঠিত মানসিক কাঠামোর ওপর তার পুরো ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

জীবন নির্ভরশীল। তাই এই পর্যায়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকারের শিক্ষা বিভাগ শিক্ষার্থীর পঠিতব্য বিষয়ের তালিকা প্রণয়ন করবে।

বিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে সূচিত শিক্ষা জীবনে সব শিক্ষার্থী একই বিষয় চর্চা করে প্রাথমিক শিক্ষার কাল অতিক্রম করবে। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিষয় বাছাইয়ের প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন হবে মাধ্যমিক পর্যায়ে। এই পর্যায়েই শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা হতে পারে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব।

প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে শিক্ষা তা প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে সূচিত হয়েছে। এই পর্যায়ে শিশু আট বছর সময় কাটায়। কালের হিসেবে তা অনেক সময়। এই সময়ে শিশু বিভিন্ন জিনিস ও বিষয়ের বর্ণনা লেখার ক্ষমতা অর্জন করবে। তাই ভাষা শিক্ষার জন্য একটি চর্চার ধারা পরিকল্পনা করা দরকার। বর্ণ পরিচয় দিয়ে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সূচিত হয়। বর্ণমালা শেখার সঙ্গে সঙ্গে শিশু ছবির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণি, উদ্ভিদ ও বস্তুর নাম শেখে। এভাবে শিশু ক্রমে বর্ণ সহযোগে শব্দ ও শব্দ সহযোগে বাক্য গঠন করতে শেখে। বাক্য গঠন করতে সমর্থ হলে শিশু তার মনের ভাব ভাষায় লিখতে পারবে। সহজ ভাষায় সহজে বিষয়গুলোর বর্ণনা লিখতে শেখার উপযুক্ত সময় এটি। তাই শিক্ষার্থীকে সহজ বিষয়ের ওপর বর্ণনা শিখতে দিতে হবে যেন সে নিজে থেকে কোনোরূপ সাহায্য ছাড়াই বিষয়ভিত্তিক রচনা লেখে। বিদ্যালয় থেকে শ্রেণিভিত্তিক সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের ব্যবস্থা করে দিলে শিক্ষার্থীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত কোনো এলাকা, শিল্প এলাকা বা শিক্ষার্থীর জন্য নতুন হবে এরূপ কোনো এলাকা ভ্রমণ করবে। ভ্রমণ শেষে শিক্ষার্থীদের ভ্রমণ বিষয়ক বর্ণনা লিখতে দিলে তারা নিজের ভাষায় ভ্রমণ বিষয়ক রচনা লিখবে। এই ভ্রমণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ছাড়া কেউ থাকে না। তাই শিক্ষার্থীকে নিজের ভাষায় বর্ণনা লিখতে হয়। কারোর কোনোরূপ সাহায্য ছাড়া লেখার এরূপ অভ্যাস ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য খুবই জরুরি। এভাবে তারা লেখার বিষয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। ভালো রচনা (প্রস্তুতকৃত) মুখস্থ করিয়ে পরীক্ষায় লিখিয়ে ১০০ তে ১০০ পাওয়ার চেষ্টার চেয়ে এই অভ্যাস শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ– কথাটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

আমাদের দেশে শিক্ষার্থীদের দুটো ভাষা বাংলা ও ইংরেজি প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পড়ানো হয়। ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আমাদের কাছে গুরুত্ব পায়। তাছাড়া আমরা বিভন্নভাবে ইংরেজি ভাষার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। ইংরেজি ভাষা হিসেবে চর্চা করার প্রয়োজন যে আমাদের রয়েছে তাতে সম্ভবত কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। কিন্তু শিক্ষার কোন স্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষা শুরু করা উচিত– তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কেউ হয়তো বলবেন পঞ্চম শ্রেণির নিচে ইংরেজি ভাষা শেখার ব্যবস্থা করা ঠিক

www.pathagar.com

হবে না। এরূপ অভিমতের সপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে। মাতৃভাষা শিক্ষার আগে বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। রবীন্দ্রনাথ তার জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'কাঁচা বয়সেই ভাষাটা জীবনের সঙ্গে গভীর করে মেলে এবং ভাষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথার্থ প্রাণ প্রাণের সঙ্গে যুক্ত হয়। আমি প্রায় ষোল বছর পর্যন্ত ইংরেজি না শিখে বাংলা শিখেছিলুম। তাতেই আমার মনের ভূমিকা পাকা করেই তৈরি হয়েছিল। সেই ভূমিকার উপর অতি সহজেই প্রায় বিনা চেষ্টায় ইংরেজি পত্তন হতে পারল।' (সাহিত্যের পথ ১৩২৯)

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা। আমাদের কথা বলা, চিন্তা করা ও স্বপ্ন দেখার সময় চিন্তা ও কল্পনার মাধ্যম হিসেবে বাংলাই তার অস্তিত্বে জানান দেয়। তাই ভাষা শিক্ষার প্রথমে আসবে বাংলা, তার পর ইংরেজি। ভাষা শিক্ষায় বাংলা ভিত্তিস্বরূপ কাজ করবে। ভিত্তি মজবুত হলে তার উপর নির্মিত ভবন যেমন মজবুত হয় তেমনি বাংলা ভাষার গাথুনি মজবুত হলে ছাত্রদের ইংরেজি ভাষার জ্ঞানও মজবুত হবে। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে দুটো ভাষাই শিক্ষার্থীকে শিখতে হবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাস রুটিনে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব প্রতিফলিত হওয়া দরকার। কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভাষার ওপর শিক্ষার্থীর দখল প্রতিষ্ঠিত না হলে উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হবে না। মাধ্যমিক পর্যায়েও দুটো ভাষা শিক্ষাই বাধ্যতামূলক থাকবে। তখন ভাষা শিক্ষার ওপর এত গুরুত্ব না দিলেও দক্ষ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে তখনও ভাষা শিক্ষা যাতে প্রাণ পায় সে দিকে নজর দিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা হবে উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি পর্ব। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর বিষয়ভিত্তিক চর্চা শুরু হয়ে যায়। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর যে যাত্রাপথ নির্দিষ্ট হবে মাধ্যমিক পর্যায়েই তার লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিতে হবে।

ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুকে সীমিত আকারে ধর্ম, পরিবেশ, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। এই বিষয়গুলোর সিলেবাস শিশুদের ধারণ ক্ষমতার উপযোগী করে তৈরি করা উচিত। ভারী সিলেবাস শিশুর মানসিক অবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। আগ্রহ হারালে শিশুর পক্ষে জ্ঞান অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

উৎসাহ ব্যতীত শিক্ষার্থী জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হয় না। লেখাপড়ায় শিক্ষার্থীর উৎসাহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের কাজ। কিন্তু শিক্ষক সেই কাজে আন্তরিক হলেও কখনো কখনো দেখা যায় অবসন্নতার ফলে শিক্ষার্থী পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে। অবসন্নতা দু'ভাবে আসতে পারে : (১) শিক্ষার্থীর রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য; (২) বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায় শিক্ষার্থীর ওপর অতিরিক্ত চাপের জন্য। বুদ্ধি

www.pathagar.com

চর্চায় পাভলবের কুকুরের কাহিনি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। কুকুর বৃত্ত থেকে উপবৃত্তের তফাৎ ধরতে শিখেছিল। কিন্তু পাভলব সাহেব উপবৃত্তের আকার প্রায় বৃত্তের কাছাকাছি নিয়ে আসতে শুরু করলে এক সময় দেখা গেল উপবৃত্তের দুটি অক্ষের অনুপাত ৯ঃ৮ এ দাঁড়িয়েছে। তখন পাভলব সাহেব লক্ষ করলেন, এই পর্যায়ে কুকুরটির ভেদবুদ্ধি ক্ষমতা লোপ পেতে বসেছে। বিদ্যালয়ে অনেক ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটে। ক্ষমতায় কুলায় না এমন কিছু শিখতে বাধ্য করা হলে শিক্ষার্থী হতবুদ্ধি ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্ম শিক্ষা ব্যতীত পঠিতব্য সবগুলো বিষয়ই সব শিশুর জন্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। পারিবারিক দিক দিয়ে যে শিশু যে ধর্মের অনুসারী তার জন্য সেই ধর্মের বই পড়া নির্ধারিত হবে। কারো কারো মতে শিশু বয়সে ধর্ম শিক্ষা মনে স্থান পেলে এর বিপরীত অন্য কোনো শিক্ষা তাকে দেয়া যায় না। তাই শিশু বয়সে ধর্ম শিক্ষাব্যবস্থার বিপক্ষে তাদের অবস্থান।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই শিশুর মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করা। শিশুদের শিক্ষার জন্য সিলেবাসে তা করা হয়ে থাকে। ধর্ম শিক্ষা বাদ দিয়ে যদি শিশুর শিক্ষা পরিকল্পিত হয় এবং ধর্ম শিক্ষার বিরোধী বিষয়গুলো শিশুর মনে ঢুকে পড়ে তাহলে পরবর্তী সময়ে শিশুকে ধর্মের বিষয়ে শিক্ষা দেয়াও কঠিন হবে।

শিশুদের ধর্মশিক্ষা দেয়া না দেয়ার পেছনে যুক্তি দেখানো যায়। এসব যুক্তি দেখিয়ে বা কথার পিঠে কথা বলে কোনো লাভ নেই। আমার মনে হয় যুক্তিবিদদের এখানে একমত হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো দরকার যাতে শিক্ষার্থী জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি যুক্তিবুদ্ধির ব্যবহার শিখতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেল তার Power বইয়ে বলেছেন, "আমার হাতে শিক্ষার দায়িত্ব থাকলে আমি বিতর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ের উভয় দিকের কুশলী বক্তাদের বক্তব্য রেডিওর মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতাম। ব্যবহৃত যুক্তিগুলো যাতে ছাত্ররা ভালোভাবে বুঝতে পারে তার জন্য শিক্ষকদের সাহায্য করতে বলতাম।" ছাত্রদেরকে যুক্তি বুদ্ধির ব্যবহার বুঝিয়ে দিতে পারলে তারা নিজেরাই কোনো বিষয়ে যুক্তি ব্যবহার করে তা গ্রহণ বা বর্জনের পথ খুঁজে বের করতে পারে।

যুক্তি ও বুদ্ধির ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ যে কোনো সমস্যার সমাধান আলাপ আলোচনা করে বের করার প্রয়াস পায়। তারা সমস্যা সৃষ্টি করে না। বরং সৃষ্ট সমস্যার যথাযথ সমাধান খুঁজে বের করে। শিক্ষাজীবনে ছাত্রদের জ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির ব্যবহার শেখালে উচ্চ শিক্ষায় ছাত্রের মনে চিন্তাশক্তি জাগ্রত হবেই।

মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার বলয়ে ঢুকে গেলে তার জ্ঞান চর্চায় চিন্তার ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। শিক্ষার্থীকে চিন্তা কাজে লাগিয়ে সমস্যা বুঝতে হয় ও সমাধান খুঁজে বের করতে হয়। আমরা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেই উচ্চ শিক্ষা বলে বুঝি। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি জ্ঞান

www.pathagar.com

উৎপাদনও করে। টাইম ইউনির্ভাসিটি র‍্যাংকিং কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর পৃথিবীর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করে। লক্ষ করার বিষয় যে জ্ঞান বিতরণ এবং নতুন জ্ঞান উৎপাদন এ দুটোকেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ বলে বিবেচনা করে। তারা তেরোটি বিষয়ের ওপর বিভিন্ন অনুপাতে পয়েন্ট দিয়ে থাকে। শিক্ষকদের যোগ্যতা, গবেষণার পরিমাণ, পিএইচ.ডি ছাত্রের সংখ্যা, আন্তর্জাতিক ছাত্রের সংখ্যা ইত্যাদি। তবে পয়েন্ট গণনায় সব চাইতে গুরুত্ব দেওয়া হয় গবেষণাকে। এই গবেষণা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে চিন্তাশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার হয়ে থাকে। তাই শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সাথে সাথে চিন্তাশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠবে– এটাই স্বাভাবিক। উপরে বর্ণিত বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং এর তালিকায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উঠে আসতে পারেনি।

আশঙ্কা থেকেই যায় যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুরু থেকেই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে কি না। পৃথিবীর সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করা এবং আন্তর্জাতিক একাডেমিক পত্রিকায় গবেষণা নিবন্ধ লেখা শিক্ষকদের অবশ্য কর্তব্যের অংশ বিশেষ। এভাবেই তারা সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলে এবং নিজেদের জ্ঞানকে যুগোপযোগী করে রাখে। আমাদের দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই কিছু শিক্ষক রয়েছেন যারা আন্তর্জাতিক মানের পত্রিকায় নিজেদের গবেষণাপত্র ছাপাচ্ছেন কিন্তু সেটি অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রবণতা নয়।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, সাধারণভাবে আমাদের দেশে জ্ঞান বিমুখতা লক্ষ করা যায়। ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করা এবং পরীক্ষা পাস করে সার্টিফিকেট লাভ করার মতো মনোভাব শিক্ষার্থীদের রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু ভাসা ভাসা জ্ঞান দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করা যায় না। তাই পাকিস্তান আমলে সেন্ট্রাল সুপিয়র পরীক্ষায় একটি নিয়মের কথা বলে দেয়া হতো : " কোনো বিষয়ে শতকরা পঁচিশ ভাগের নিচে প্রাপ্ত নম্বর শূন্যের কোটায় নামিয়ে দেয়া হবে। কারণ তা ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জনের কথাই বলে দেয় যা এই চাকরিতে কোনো কাজে আসে না।"

একটি দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন একটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তার জন্যে প্রয়োজন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাতে দেশে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ তৈরি করে দেশ গড়ার যোগ্য মানুষের অভাব দূর করা যায়। সময় দ্রুত অপসৃয়মাণ। দেশের চেহারা বদলাতে হলে দরকার সময়কে গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করা। অবিরাম গবেষণার মাধ্যমে পুরনো জ্ঞানকে যাচাই করা ও নতুন জ্ঞানের জন্ম দিয়ে তা বাস্তবায়িত করা। কিন্ত জ্ঞানবিমুখতা জাতিগত বৈশিষ্ট্য হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ালে সব ক্ষেত্রে একটা লেজে গোবরে অবস্থা দেখা দেবে যা একটি পতনোন্মুখ সমাজের কথাই আমাদের বলে দেবে।

শেষ দিকে শিক্ষা প্রসারের বিষয়টি নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন বলে মনে হয়। শিক্ষার প্রসার দুটি দিক দিয়ে কার্যকরী হতে দেখা যায় : আনুভূমিক (Horizantal) ও উল্লম্ব (Vertical)। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠী যাতে শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে আসতে পারে তার জন্য শিক্ষার অনুভূমিক প্রসার ঘটানো জরুরি। আমরা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছিয়ে দেয়ার কথা বলতে পারি। সরকার দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে তা অবৈতনিক করে দিচ্ছে। অবশ্যই তা সরকারের প্রচেষ্টার ইতিবাচক দিক। কিন্তু শিক্ষা অবৈতনিক করে দিলেই গ্রামের গরিব কৃষক তার ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দেয় না। তার ঘরে দুবেলা খাবারের সংস্থান না হলে সে তার শিশুপুত্রকে মাঠে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দেয়। সরকারের শিক্ষা বিষয়ক পরামর্শক যারা আছেন তারা এ ব্যাপারে গবেষণা করে দেখবেন। শিক্ষার উল্লম্ব প্রসার হলো উচ্চ শিক্ষাকে শক্তিশালী করা। আমাদের দেশের উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলো যাতে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিং-এ নির্দিষ্ট পর্যায়ে পৌঁছতে পারে সেদিকে মনোযোগ দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সফল না হলে দেশ গড়া ও দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পাওয়া দুষ্কর হবে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা

শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াই পরীক্ষা। সব শিক্ষার্থীর মেধা ও জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা এক রকম নয়। তাই তাদের অর্জিত জ্ঞানে পার্থক্য হয়ে যায়। এই পার্থক্য সৃষ্ট হয়ে যায় বলেই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে শিক্ষার্থীর কে, কী এবং কতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হলো তা একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ফেলে নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়। নির্দিষ্ট মাপকাটিতে ফেলে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান নির্ধারণ করার যে প্রক্রিয়া তা-ই পরীক্ষা। পরীক্ষা এই বিশ্বের সব দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে দেশভেদে বা প্রতিষ্ঠানভেদে পরীক্ষার ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

পরীক্ষার দুটো নেতিবাচক দিক রয়েছে। এক. তা শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিযোগিতায় ফেলে দেয়। দুই. সাধারণত পরীক্ষার প্রশ্নের জন্য একটি নির্দিষ্ট সিলেবাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। সিলেবাস শিক্ষার্থীকে একটি নির্দিষ্ট জ্ঞানের বৃত্তে আবদ্ধ করে ফেলে। এই দুটো নেতিবাচক দিকই ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

এক. পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতাকে আমরা আমাদের সৃজনী চেতনায় লালন করতে পারি না। এর অনেক কারণ রয়েছে। তবে এখানে কেবল উল্লেখ করা যেতে পারে যে জ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়েই বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত হয়। স্কুলে বৃত্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। কিন্তু এই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব অনেক দিক দিয়েই আপত্তিজনক। তা তরুণদেরকে বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব উপলব্ধি করার সুযোগ দেয় না। শিক্ষার্থীরা বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুরুত্বের আলোকে নয়, বরং পরীক্ষায় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের দিকে তাকাতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই প্রতিযোগিতায় যে সামর্থ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা সদাপ্রস্তুত স্থির প্রশ্নের অপরিপক্ব উত্তর আয়ত্ত করার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়াও দেখা যায় তরুণরা এর ফলে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হয়। পরিণতিস্বরূপ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে প্রাণশক্তি লোপ পায়, অনেক

www.pathagar.com

সুন্দর মনের ধার ভোতা হয় এবং শিক্ষার প্রতি তাদের যে আগ্রহ থাকার কথা তা ধ্বংস হয়ে যায়।

দুই. একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পরীক্ষা জ্ঞান অর্জনে একটি প্রয়োজনীয় সীমার কথা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রয়োজনের জন্য জ্ঞান অর্জন করা এক ধরনের বাধ্যবাধকতা ও সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। আমি যা জানতে আগ্রহী নই তা আমাকে জানতে হবে। তাছাড়া যা জানব তাও একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে যায়। এই বাধ্যবাধকতা ও সীমাবদ্ধতার দরুন জ্ঞানার্জন সীমিত হয়ে পড়ে। তাই পরীক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে একটি বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে।

উপরে বর্ণিত দুটো কারণই আমাদের পরীক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেয়। তথাপি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। কারণ ভালো পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যতীত শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা যায় না। পরীক্ষা পদ্ধতিতে কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি থাকলে তা দূর করতে হবে। এর জন্য প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আজ একথা স্পষ্ট যে কোনো দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা এর শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। আবার শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত পর্যায়ে ধরে রাখতে সক্ষম। যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত ভালো সে দেশের মানুষ তত শিক্ষিত। একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উন্নত রাষ্ট্রগঠনে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম।

শিক্ষা সম্বন্ধে যারা চিন্তা ভাবনা করেন তাদের কেউই একথা অস্বীকার করবেন না যে ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের যথাযথ মূল্যায়নই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং তার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত জ্ঞান চর্চাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধরা যাক কোনো পরীক্ষা পদ্ধতির অধীনে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রশ্নকর্তা দেখতে পেলেন যে নিয়মানুযায়ী তিনি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন করতে বাধ্য। আবার কোনো কোনো প্রশ্ন তিনি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করতে পারছেন না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সম্ভাব্য প্রশ্নের একটি তালিকা করে ফেলতে পারে। সম্ভাব্য প্রশ্নের তালিকা প্রস্তুত হয়ে গেলে কোনো শিক্ষার্থী এর বাইরে কিছু শিখতে যাবে না। ফলে সিলেবাস যত বড়ই হোক না কেন কার্যকরী সিলেবাস সংকুচিত হয়ে পড়বেই। পরিণতিস্বরূপ শিক্ষার্থীর জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। যাদের জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র যত ছোট জ্ঞান সেখানে সীমাবদ্ধ হবেই।

আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসিসহ বোর্ডের অধীন বিভিন্ন পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষায় ছাত্রদের সৃজনশীল মেধা উজ্জীবিত হওয়ার কথা। তাই সৃজনশীল প্রশ্ন সম্বলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ভালো পরীক্ষা পদ্ধতি হতে পারে– সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা যদি বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে প্রশ্নের দিকে তাকাই তাহলে এর সবটুকু সৃজনশীল– তা বলতে পারি না। আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ সজাগ দৃষ্টি রেখে আস্তে আস্তে প্রণীত প্রশ্নগুলো যাতে পুরোপুরি সৃজনশীল হয় সেদিকে যত্নবান হবেন।

পরীক্ষা জ্ঞানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। তাই বিভিন্নমুখী জ্ঞানের মূল্যায়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রশ্নের মধ্যে এর ব্যবস্থা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা যায় শিক্ষার্থী ভাষা শিক্ষায় বিভিন্ন রকম যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। ভাব সম্প্রসারণ লেখা, কোনো প্রবন্ধের বা এর অংশবিশেষের সারাংশ লেখা এবং ব্যাকরণ ভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর লেখার মতো যোগ্যতার কথা উল্লেখ করা যায়। এরকম আরেকটি যোগ্যতা হচ্ছে বিষয়ভিত্তিক রচনা লেখার যোগ্যতা। কোনো পরীক্ষায় নদী সম্পর্কে রচনা লেখার জন্য প্রশ্ন করা হলে পরীক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় মুখস্থ রচনা লিখে আসলে তার ওপর পরীক্ষক কী নম্বর প্রদান করবেন? পরীক্ষায় রচনা লিখতে চাওয়ার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার ক্ষমতা জানতে চাওয়া নয়। পরীক্ষার্থী রচনার বিষয়টি কতটুকু জানে এবং তা কত সুন্দরভাবে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে– তা পরখ করে দেখা। তাই পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থী রচনা লিখবে নিজস্ব ভাষায় তাৎক্ষণিকভাবে।

উপরে বর্ণিত রচনা সম্পর্কিত বাস্তবায়নের জন্য পরীক্ষার প্রশ্ন এমনভাবে প্রণীত হবে যেন ছাত্ররা রচনা মুখস্থ করে এসে উত্তর লিখতে না পারে। এ উদ্দেশ্যে রচনা লেখার একটা গাইড লাইন আরোপিত হতে পারে। এই গাইড লাইনের বাইরে গিয়ে পরীক্ষার্থী কিছু লিখলে তা মূল্যায়নের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

এসব কিছু বলার উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার্থী রচনা লিখতে গিয়ে যেন তার জ্ঞান ও মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু একটু খোঁজ নিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে আমাদের দেশের বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা রচনা লিখতে গিয়ে তাদের মুখস্থ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতার ব্যবহার করে থাকে।

সাধারণত আমাদের দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়ার একটি ব্যাপার লক্ষ করা যায়। পরীক্ষার্থীরা নিজেরা অথবা টিচারদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের একটি সাজেশন করে থাকে। প্রাইভেট কোচিং সেন্টারে এই সাজেশন তৈরি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কোচিং সেন্টারের তৈরি সাজেশন পরীক্ষায় কমন পাওয়া যায় তার জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। এই প্রশ্ন কমন পাওয়ার বিষয়টি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য খুবই উপযোগী। কিন্তু তা জ্ঞান লাভের পুরোপুরি বিপরীত। যে শিক্ষার্থীরা নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে

www.pathagar.com

পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে ভালো ফলাফল লাভে সমর্থ হয় তারা যথার্থ জ্ঞান লাভে অক্ষম। এ কারণেই পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যেন পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করা অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

প্রশ্ন কমন পড়ার ব্যাপারটি প্রশ্নকর্তার ধ্যানধারণার ওপর নির্ভর করে। এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি বিষয়ের একটি প্রশ্ন বিবেচনায় নেয়া যায়। ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের একটি প্রশ্ন এরূপ হতে পারে– "You are a reporter of a national daily. You have enjoyed the Annual Spors held in your college. Write a report of it to publish in the newspaper." এইচএসসি স্তরের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান এই প্রশ্নের উত্তর লেখার উপযোগী হলে প্রস্তুতকৃত উত্তর মুখস্থ করে লেখার প্রয়োজন পড়বে না। খবরের কাগজে এরূপ প্রতিবেদন লেখার নিয়মকানুন জেনে নিলেই পরীক্ষার্থীর উত্তর লিখতে পারার কথা। কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের ইংরেজি জ্ঞান এই পর্যায়ে উন্নীত না হলে এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর লেখার জন্য পরীক্ষার্থীরা সাজেশন মাফিক প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করে আসবে এবং প্রশ্ন কমন পড়লেই কেবল উত্তর লিখতে সমর্থ হবে। অন্যথায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে না পেরে দুশ্চিন্তায় পতিত হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তা যদি এরূপ কিছু নির্ধারিত প্রশ্নের ভিতর থেকে প্রশ্ন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন এবং পরীক্ষার্থীরা ওই নির্বাচিত প্রশ্নের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয় তবে তারা প্রশ্নগুলোর প্রস্তুতকৃত উত্তর মুখস্থ করবেই। নির্বাচিত কিছু প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্নকর্তাদের সীমাবদ্ধ থাকার ব্যাপারটি পরীক্ষার্থীদের পাস করিয়ে নেবার চিন্তা থেকে আসতে পারে।

কিছু গতানুগতিক প্রশ্নের উত্তর (সদাপ্রস্তুত) মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে পরীক্ষাথীরা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে। এই ফলাফল পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিচায়ক হতে পারে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে ছাত্রদের মানসিক উন্নতি ও জ্ঞান অর্জনের মধ্যে একটি সঙ্গতি থাকা প্রয়োজন। এই সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য একটি সঠিক পরীক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার্থীরা সাজেশন অনুযায়ী পড়ে কমন পড়া প্রশ্নের উত্তর লিখে ভালো ফলাফল লাভ করে তা ভালো পরীক্ষা পদ্ধতি হতে পারে না। কিন্তু যে পরীক্ষা পদ্ধতিতে সম্ভাব্য প্রশ্ন নয় বরং ছাত্রের মানসিক উন্নতির সঙ্গে মানানসই জ্ঞান অর্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন করা হয় তাই ভালো পরীক্ষা পদ্ধতি। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা অধীত বিষয় থেকে প্রণীত প্রশ্নের ধরন দেখে কখনো কোনো সাজেশন তৈরি করতে পারে না। অধীত বিষয় শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝে মনমগজে ধারণ করতে পারলেই তারা উত্তর লিখতে সমর্থ হবে।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার বিভিন্ন স্তর পার হয়ে আসার সময় স্তরভিত্তিক ভাষাগত জ্ঞানে উন্নতি লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক কথা। ধরা যাক

www.pathagar.com

একটি বিশেষ স্তরে এসে শিক্ষার্থীরা ওই স্তরের ভাষাগত জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হলো। জটিল কয়েকটি বাক্যের প্রত্যেকটিকে চারভাগে ভাগ করে এলোমেলোভাবে একটি ছকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। প্রশ্ন করা হলো পরীক্ষার্থীরা বাক্যাংশগুলোর মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে যথাযথভাবে লিখে পূর্ণ বাক্য গঠন করবে। জটিল বাক্য গঠনে শিক্ষার্থী কতটা দক্ষ হয়েছে– তা দেখাই এরূপ প্রশ্নের উদ্দেশ্য। তাই এই পর্যায়ে বিশেষ মাত্রার জটিল বাক্য (যেকোনো) গঠন করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাই করার কথা। কিন্তু কোনো এক বিশেষ (এইচএসসি) পরীক্ষার প্রশ্নের ওই অংশেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আমি ওই খণ্ডিত বাক্যাংশগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বাক্য গঠনের বিষয়টি পরখ করে দেখার চেষ্টা করি। বিষয় আমার কাছে খুব সহজ মনে হয়নি। তাই আমার পরিচিত কয়েক পরীক্ষার্থীকে ওই প্রশ্নের উত্তর লিখতে পেরেছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। তারা নির্দেশিত সবগুলো বাক্য গঠনে সমর্থ হয়েছে বলে আমাকে জানাল। আমি তাদেরকে সমমানের জটিল বাক্য ব্যবহার করে অনুরূপ প্রশ্ন তৈরি করে দিলে উত্তর লিখতে সক্ষম হবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে তারা সরলভাবেই তাদের অক্ষমতার কথা আমাকে বলে। তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে শিক্ষার্থীরা সাজেশন অনুসরণ করে এই প্রশ্নটা কমন পেয়েছে বলে উত্তর লিখতে সক্ষম হয়েছে।

ভাষা শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা মুক্ত হস্তে (তাদের নিজস্ব স্তর অনুযায়ী) লিখতে পারার ক্ষমতা অর্জন করবে। বাস্তব জীবনে দেশের যোগ্য নাগরিকদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে অনেক বিষয়েই নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে হয়। শিক্ষা জীবনে নানা বিষয়ে মুক্ত বর্ণনা লেখার অভ্যাস করলে বাস্তব জীবনে কেউই নিজ পেশায় প্রয়োজনীয় লেখার কাজ চালিয়ে যেতে অসুবিধায় পড়বে না। তাই পরীক্ষার্থীদের বিষয়ের বর্ণনা মুক্তভাবে লেখার সক্ষমতা যাচাইয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রশ্ন প্রণয়ন করা উচিত।

ভাষাজ্ঞান যে কোনো বিষয়ে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তাই ভাষা শিক্ষার ওপর প্রণীত প্রশ্ন নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। বস্তুত সব বিষয়েই প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্ন প্রণয়নে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কোনো বিষয়েই প্রণীত প্রশ্ন এমন হবে না যেন পরীক্ষার্থীরা সাজেশন অনুসরণ করে পরীক্ষা দিয়ে সহজে সফল হতে পারে। প্রশ্ন এমন হবে যেন শিক্ষার্থী বিষয়ভিত্তিক প্রকৃত জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হলেই কেবল উত্তর লিখতে পারবে। যারা শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত কেবল ক্লাসে পড়ানোই তাদের কাজ নয় বা পরীক্ষার সময় এলেই জানা প্রশ্ন থেকে কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করে দেয়া নয়। সারা বছরই পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা তাদের সৃজনী প্রতিভা ব্যবহার করে ছাত্রদের মেধা যাচাইয়ের জন্য যথাযথ প্রশ্ন তৈরি করবেন। এভাবে প্রতি বছর পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন প্রণীত হবে তার কোনো

www.pathagar.com

প্রশ্নই আগে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে না। পরীক্ষায় নিত্য নতুন প্রশ্নের মোকাবেলা করতে গিয়ে কোনো ছাত্রই সাজেশনের মতো মেধা বিধ্বংসী বিষয়ের আশ্রয় নিতে যাবে না। ছাত্ররা ক্লাসের প্রতি মনোযোগী হবে এবং অধীত বিষয়ের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। পরীক্ষায় সুষ্ঠু ব্যবস্থা অর্জিত হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাণ পাবে। এভাবে দেশে যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি হবে তারা প্রকৃত দেশ গড়ার কাজে অংশ নিতে সক্ষম হবে। কেবল যোগ্যতা দিয়েই তারা দেশ সেবা করবে না বরং সততা ও আন্তরিকতা দিয়েও দেশ সেবায় মনোযোগী হবে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো মানুষ নিজের দেশকে না ভালোবেসে থাকতে পারেন না। তাই সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতির মাধমে ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ভালো শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরির প্রচেষ্টায় আমাদের দেশের নেতৃবর্গের নিয়োজিত হবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা উচিত।

ষোলো কোটি মানুষের এদেশে জনগণ অশিক্ষিত হয়ে থাকলে বা প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে দেশের জন্য মানুষ বোঝা হয়ে থাকবে। কিন্তু ষোলো কোটি মানুষের একটি বড় অংশকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে প্রত্যেকের দুটো করে কাজের হাত দেশ সেবায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আজকাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ যুগে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তুলতে না পারলে বিশ্বের উন্নয়নের সাথে বাংলাদেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হবে। আজ অর্থনীতি, ব্যবসায়, বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল ইত্যাদিতে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে যদি আমরা যুগোপযোগী শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে না পারি, তাহলে কি আমরা বিশ্বের আরো দশটা দেশের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারব? এই বিষয়টি মাথায় নিয়েই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আমাদের তাকাতে হবে।

---

www.pathagar.com

ঐতিহ্য

ISBN 978-984-776-222-7

www.pathagar.com